মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার ইতিহাস

(২০০৪-২০১৬ পর্যন্ত)

উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান

মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার ইতিহাস

(২০০৪-২০১৬ পর্যন্ত)

উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
প্রধান শিক্ষিকা, মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী

মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার ইতিহাস
(২০০৪-২০১৬ পর্যন্ত)
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান

প্রকাশক
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
নওদাপাড়া, (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৯৬২-৬২২৫০৭

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
জমাদিউল উলা ১৪৩৭ হিজরী
ফাল্গুন ১৪২২ বঙ্গাব্দ

[বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

MOHELA SALAFIA MADRASHAR ITIHAS (2004-2016 PORJONTO), *Written by Umme Mariam Razia Binte Azizur Rhaman and Published by* ***Nibras Prokashoni****, Nawdapara, Rajshahi. Mobile : 01774-364355; 01962-622507.*

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর দ্বীনের খিদমাতের জন্য যুগে যুগে অনেক মহিলা আলিমা ও মুহাদ্দিছা পাঠিয়েছেন। তারপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যিনি মেয়েদের দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্বারোপ করেছেন। আরো শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গের উপর। বিশেষ করে আয়েশা (রাঃ)-এর উপর, যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে হেফাযতের ক্ষেত্রে অসমান্য অবদান রেখেছেন।

আয়েশা (রাঃ)-এর হাত ধরে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান চর্চার যে ধারা মহিলাদের মাঝে শুরু হয় তা আজ পর্যন্ত কোনদিন বন্ধ হয়নি। প্রতি যুগেই এই উম্মতের মা ও বোনেরা কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সীমাহীন অবদান রেখেছেন। 'তাক্বরীবুত তাহযীব'-এ হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রায় ৮০০ জন মহিলা রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করতেন। বর্তমান যুগে শায়খ আকরাম নাদভী প্রায় দীর্ঘ দশ বছর পরিশ্রম করে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রায় আট হাযার মহিলা মুহাদ্দিছা, শায়খা ও আলিমার জীবনী জমা করেছেন। যা অচিরেই বই আকারে প্রকাশ হবে ইনশাআল্লাহ। এই সমস্ত মহিলা মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অনেকেই অনেক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার মধ্যে কারীমা আল-মারওয়াযী (রহঃ) অন্যতম। তিনি চিরকুমারী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের দারস ও তাদরীসেই পুরো জীবনটা ব্যয় করে দিয়েছেন।

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান চর্চার ধরণেও পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান চর্চা ছিল ব্যক্তিগত দারসের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু বর্তমানে তা একাডেমিক রূপ নিয়েছে। যার ভাল-মন্দ উভয় দিকই রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা একাডেমিক রূপ নেয়ার পর থেকেই এই দেশে আহলেহাদীছদের একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক অভাব বোধ করা হচ্ছিল। ছেলেদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব না থাকলেও মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না বললেই চলে।

আল-হামদুলিল্লাহ, আজ আর সেই অভাব নেই। **'আল-মাদরাসাতুস সালাফিয়া লিল বানাত'** তথা **'মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা'** গত ২০০৪ সাল থেকে জাতির

সেই অভাব পূরণে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। আমাদের অত্র ছোট্ট কিতাবটিতে এই প্রতিষ্ঠানের গড়ে উঠার পিছনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

ইতিহাসই মুসলিম উম্মাহ্র আয়না। যখন থেকে মুসলিম উম্মাহ তার ইতিহাসকে ভুলে গেছে বা ইতিহাসচর্চা বন্ধ করে দিয়েছে, তখন থেকেই তারা নিজেদের সোনালী অতীতকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই উম্মাহকে সামনে আগানোর উৎসাহ যোগানোর জন্য ইতিহাস সংরক্ষণ ও চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। আশা করি অত্র প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মা ও বোনদের মাঝে ইলম চর্চার মানসিকতা এবং এক্ষেত্রে সময়-শ্রম-অর্থ কুরবানী করার আগ্রহ ও উৎসাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ।

বিনীত
(উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান)
প্রধান শিক্ষিকা, মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা।
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার ইতিহাস
(২০০৪-২০১৬ পর্যন্ত)

নওদাপাড়ায় আমার আগমন :

জন্ম আমার পৈত্রিক ভিটা গোবিন্দগঞ্জ গাইবান্ধায়। জীবনচক্রে ঘুরতে ঘুরতে নওদাপাড়া আসা। নওদাপাড়া আসি ২০০১ইং সনের ৩১শে মার্চ দিবাগত রাত ১ টার দিকে। প্রাচীর ঘেরা ৬ কাঠা জমির মাঝে তিন কাঠার উপর কোনমতে টিনের চাল, মাটির মেঝে ও প্লাস্টার বিহীন ইটের দেয়াল দিয়ে গড়ে তুলা মাথা গুজার আশ্রয়। বাসা হতে আসার সময় সাথে এসেছিলেন মা ও সেজো ভাই। সাথে নিয়ে আসা কিছু খাবার জিনিস দিয়ে রাতের খাবার সারার পর খাট চৌকি কোনরকম রেডি করে রাতের বিশ্রাম নেওয়া হল। সকালে উঠে শুরু হল জীবন যাপনের মহা সংগ্রাম। সম্পূর্ণ বাসায় কোন টয়লেট নেই, গোসলখানা নেই, ভাল কোন পানির ব্যবস্থাও নেই। ভাইকে সাথে করে প্রাচীর ঘেরা খোলা তিন কাঠায় সবকিছুর হালকা করে ব্যবস্থা করা হল। দুই একদিন পর মা ও ভাই চলে গেলেন। ছোট হতে পিতা-মাতা, ভাইবোন সবার সাথে বসবাস করে অভ্যস্ত। দাখিল পাস করার পর হতে গ্রামে অবস্থিত 'জান্নাতপুর মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা'য় প্রথম ৫ বছর সহকারী হিসাবে অতঃপর পরবর্তী ৩ বছর প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। এখানে এসে পিতা-মাতাহীন নতুন পরিবেশে নতুন এক জীবন শুরু করলাম।

নওদাপাড়ার তৎকালীন অবস্থা :

বাড়ীর পাশেই বিরাট আম বাগান। আমগাছগুলো কত বছরের পুরনো আল্লাহই ভাল জানেন। পাশেই ট্রাক টার্মিনাল, বিখ্যাত টেক্সটাইল মিল ও বিমানবন্দর। বাইপাস সড়কের কাজ তখনও শেষ হয়নি। মূল রাজশাহী শহর প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

আশেপাশে পরিচিত বলতে কেউ নেই। যারা স্থানীয় তাদের অনেককেই দেখা যায় মাদকাসক্ত। তরুণ ছেলেরা বিভিন্ন নেশা ও জুয়া নিয়ে ব্যস্ত। দিনের বেলায় বাড়ীর পাশের বড় গাছগুলোর মগ ডালে উঠে হৈ চৈ করে। সাউন্ডবক্স লাগিয়ে জোরে জোরে গান বাজায়। এই রকম একটা উদ্ভট পরিবেশে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে বসবাস করা যে কতটা কঠিন তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। বিষয়টা আরো জটিল আকার ধারণ করে, যখন বাড়ীর মালিক বিভিন্ন যেলায় সম্মেলন করার জন্য বাড়ী ছেড়ে যান। তখন এই রকম অচেনা

অপরিচিত জায়গায় ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে থাকতে কি পরিমাণ যে ভয় লাগত তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। প্রথম দিকে পাশের বাড়ীর শাকিলের নানী এসে থাকতেন। বৃদ্ধ মানুষ হলেও আমাকে ও আমার ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন-আমীন!!

নওদাপাড়াতে সবচেয়ে যেটা ভয়ের কারণ ছিল সেটা হচ্ছে- ধর্মহীনতা। আশেপাশের লোকজন তেমন শিক্ষিত না। গান-বাজনা, নেশা ও জুয়াই যেন তাদের আনন্দের খোরাক। মাঝে মধ্যে আমার বড় ছেলে আব্দুল্লাহকে বলি, আব্বু! ঐ ছেলেগুলোর নিকট গিয়ে জোরে সালাম দিয়ে বলবে যে, আমার আম্মু আপনাদেরকে গাছ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ৬ বছরের ছোট ছেলে হলেও যা শিখিয়ে দেই সাহসিকতার সাথে সেভাবেই গিয়ে বলে। তখন তারা গাছ থেকে নেমে যায়। গান বাজাতে নিষেধ করার জন্যও আবার ছেলেকে অনুরূপভাবে বলে পাঠাই। তাতে কিছুটা কমে। আবারও বেশি হয়। আবার পাঠাই আবার একটু কমে। এভাবে দিন যায় রাত্রি যায়। খুব অশান্তি, কোন ভাবেই ভাল লাগে না।

কারণের সন্ধানে :

এলাকার পরিবেশের কারণে অন্তরের মাঝে ভয়ের পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক মানুষের অবস্থা দেখে বেদনাও কাজ করছিল। তাদের ধর্মহীনতা, মাদকতা ও বাদ্যযন্ত্রে মগ্ন থাকার পিছনে কী কারণ হতে পারে তা ভাবতে লাগলাম। বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা শেষে অনুমেয় হল যে, অত্র এলাকায় নওদাপাড়া আমচত্বরে ইসলামী মারকায থাকলেও মেয়েদের দ্বীনী শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থাপনা নেই। অত্র এলাকার নারী সমাজকে যদি প্রকৃত দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায় তাহলে তারা তাদের পরিবারকে অন্তত হলেও কিছুটা তো বুঝাতে সক্ষম হবে। কেননা একটা পরিবারের আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, উত্তম শিষ্টাচার মূলত একজন নারীর উপর নির্ভর করে। যা দ্বীনী শিক্ষা ছাড়া আশা করা অকাশ কুসুম কল্পনা। পানিপূর্ণ পুকুর ছাড়া যেমন মাছের আশা করা যায় না, তেমনি দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত নারী ছাড়া একটি সুন্দর পরিবারের আশা করা যায় না। একজন সুন্দর মা উপহার দিতে পারে একটি সুন্দর পরিবার। একটি সুন্দর পরিবার উপহার দিতে পারে একটি সুন্দর সমাজ। আর একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিতে পারে একটি সুন্দর জাতি। এভাবেই তো গড়ে উঠবে একটি

সুন্দর রাষ্ট্র। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করলাম, যেভাবেই হোক এখানে একটি মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যাত্রা যেভাবে :

একদিন বর্তমান সহকারী শিক্ষিকা খালেদা ভাবী আমার বাসায় এমনিতেই সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য বেড়াতে আসলেন। সাথে ছিল তার মেয়ে জারীন। কথার এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েকে কোথায় ভর্তি করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, কোথায় যে ভর্তি করি, কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তিনি আরও বললেন, পাশের রুস্তম হুযুরের স্ত্রীর সাথে একদিন কথা বলছিলাম তিনি বলেছেন, স্কুলে পড়ানো ছাড়া কোন পথ নেই। কিন্তু ওর আব্বা (শামসুল মাস্টার ছাহেব) মেয়েকে কোনক্রমেই স্কুলে পড়াবেন না। কি করা যায় তাই নিয়ে অনেক টেনশনে আছি। আমি বললাম, কোন টেনশন নেই। নিন আমরা সবাই মিলে এখানে একটা মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করি। তিনি বললেন, আপনি পারবেন চালাতে? আমি বললাম হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ পারব। কেননা আমার মায়ের বাড়ী গাইবান্ধা গোবিন্দগঞ্জে মহিলা মাদরাসা চালিয়েছি। ইনশাআল্লাহ আমি পারব। তখন তিনি বললেন, তাহলে তো অনেক ভাল হয়। আমি এক কাজ করি, কাল থেকে আমার জারীনকে আপনার কাছে পাঠাই। আমি বললাম, ঠিক আছে পাঠাতে পারেন। এভাবে আমাদের কথা শেষ হল।

পরের দিন জারীন সকাল ৯ টার সময় আমার কাছে আসল। তাকে পড়ানো শুরু করলাম। কয়েক দিন পার হয়ে গেল। খালেদা ভাবিও আমার নিকট আসলেন জারীনের খোঁজ-খবর নিতে। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন পড়ছে? আমি বললাম, ভাবি! আসলে একটা মেয়েকে কতদিন এভাবে পড়াবো? তার চেয়ে আমি মাদরাসার কথা বলছিলাম, যদি একটা মাদরাসা করা যেত, তাহলে অনেক ভাল হত। তিনি আবারো সম্মতি প্রকাশ করলেন। পরে বিষয়টি নিয়ে জনাব আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, জারীনের আব্বু জনাব শামসুল মাস্টার ছাহেব ও 'আত-তাহরীক' পত্রিকার সম্পাদক জনাব সাখাওয়াত হোসাইন ছাহেব পরস্পর আলোচনা করলেন। তারা বিষয়টি আলোচনা করে সম্মতিতে পৌঁছলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা :

তাদের পক্ষ থেকে সম্মতি বুঝতে পেরে এলাকার মহিলাদের দাওয়াত দিলাম। দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা করল পাশের বাড়ীর আবুল ভাইয়ের স্ত্রী। বিকালে বেশকিছু মহিলা এসে উপস্থিত হল। তাদের বসতে দেবার মত তেমন

কোন মাদুর বা পাটি ছিল না। অগত্যা বক্স হতে কাঁথা বের করে উঠানের মেঝেতে বিছিয়ে তাদের বসতে দিলাম। আলোচনার মাঝে তাদের সামনে বিষয়টি বিস্তারিত উল্লেখ করলাম। তাদেরকে বললাম, 'আমরা এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করছি। যদি আপনারা আমাদের সহযোগিতা করেন, তাহলে আমরা প্রতিষ্ঠানের কাজ চালু করব ইনশাআল্লাহ। আর আপনাদের সহযোগিতা হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে ভর্তি করানো, সুপরামর্শ দেওয়া, পাশাপাশি আর্থিকভাবেও যে যা পারেন তা দিয়ে সহযোগিতা করা'।

উপস্থিত মহিলাগণ বেশ ভাল সাড়া দিলেন। তাদের কথামত ২০০৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী হতে প্রতিষ্ঠানের কাজ চালু করলাম। প্রথম অবস্থায় ছাত্রী ভর্তি হল মাত্র **১৮** জন। ক্লাসে উপস্থিতি মাত্র **১২** জন। শিক্ষিকা হিসাবে সহযোগিতা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন খালেদা ভাবী। বর্তমানে তিনি মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার সহকারী শিক্ষিকা। শরীফা ভাবীকেও প্রস্তাব দিলাম। তিনি সবেমাত্র আলিম পাশ করে অনার্সে ভর্তি হয়েছেন। তার লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটবে মনে করে তিনি রাযী হচ্ছিলেন না। তারপরেও প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে আমাদের অনুরোধ তিনি রক্ষা করলেন। এভাবে তিনজন শিক্ষিকা ও **১২** জন ছাত্রীসহ প্রতিষ্ঠান এক অজানা গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করল। শিশু শ্রেণীতে ৫ জন। **১**ম শ্রেণীতে ৬ জন। ২য় শ্রেণীতে কোন ছাত্রী নেই। ৩য় শ্রেণীতে মাত্র **১** জন। এই মোট **১২** জন ছাত্রী নিয়ে মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত ছাহেবের বাসায় ক্লাস চালু হয়। যদিও তার বাসা অনেক ছোট ছিল। তার বাসায় সদস্য সংখ্যা একদম কম হওয়ায় নিরিবিলি থাকত। মহিলা মাদরাসার জন্য যা ছিল উপযুক্ত।

স্থানান্তর :

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত ছাহেবের বাসায় ক্লাস কিছু দিন যেতে না যেতেই শরীফা ভাবী আমাকে বললেন, 'ভাবী! আমার বাসায় এখন যাকির ভাইয়া (সম্পাদক ছাহেবের ছোট ভাই) আসবেন। তিনি এখানে থেকে লেখাপড়া করবেন। তাই আমার বাসায় আর ক্লাস করা সম্ভব হবে না'। তার মেহমান আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াল। মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। মাদরাসার নিজস্ব কোন জমি-জায়গাও নেই। তেমন কোন পরিকল্পনা ও আর্থিক ব্যবস্থাও নেই। যাত্রার শুরুতেই এটা আমাদের জন্য একটা চরম ধাক্কা ছিল। সাহস হারালাম না। নিরাশও হলাম না। আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা করে আমার বাসাতেই ক্লাস চালু করলাম। আমার বাসা বিভিন্ন কারণে প্রতিষ্ঠানের

জন্য উপযুক্ত ছিল না। সম্পাদক ছাহেবের বাসার মেঝে ছিল পাকা। আমার বাসার মেঝে তখন মাটির। তার বাসার তুলনায় আমার বাসার সদস্য সংখ্যা বেশী। ছোট ছোট তিনটা ছেলে। পরিবেশ পরিষ্কার রাখা অনেক মুশকিল। সর্বোপরি আত্মীয়-স্বজন কেউ না কেউ সবসময় বাসায় থাকত। আর মেহমানের কথা না হয় নাই বললাম। যাইহোক আমার বাসায় কিছু মাদুর বিছিয়ে মাটির উপরই ক্লাস চালু করা হল।

ভাসমান প্রতিষ্ঠান :

অস্থায়ীভাবে বাসায় বাসায় এভাবে আর কতদিন ক্লাস করা যায়? এলাকার প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি হাজী আব্দুল হাফীযের এলাকার মসজিদের জন্য দান করা মাত্র পৌনে এক কাঠা জমি ছিল। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের তিনজন মিলে সেখানে মাদরাসা স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিলেন। দাঁড় করানো হল এক ঝুপড়ি টিনের ঘর। সাধারণ গ্রামের মানুষের রান্না ঘর কিংবা গোয়াল ঘরও তার চেয়ে বেশী প্রশস্ত হয়। সেই ঘরের মধ্যে চাটাইয়ের পার্টিশন দিয়ে একদিকে শিশু অপর দিকে **১**ম শ্রেণী এবং বাহিরে বাউন্ডারী হিসাবে যে চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া আছে তার ছায়ায় তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস। এভাবে চলতে লাগল আমাদের ভাংগা মাদরাসা। পার হয়ে গেল একটি বছর।

এক মহাবিপদ :

শুরু হল ২০০৫ সাল। বিপদের নাকারা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। প্রলয়ংকরী দুর্যোগ। ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত দু'টার সময় গ্রেফতার হলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী সহ আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই ভয়াবহ দিনে আমার বাড়ীতে সেদিন কি ঘটেছিল তা নিয়ে আমার একটি লেখা **'স্মরণীয় ২২ শে ফেব্রুয়ারী : একমাত্র সহায় আল্লাহ'** নামে মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু সেই দিনটাও ইতিহাসের অংশ তাই পাঠকের সুবিধার্থে সেই লেখাটা সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে পেশ করা হল।

স্মরণীয় ২২ শে ফেব্রুয়ারী : একমাত্র সহায় আল্লাহ

মানুষের জীবনে কোন কোন দিন বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকে। আমার জীবনেও দু'টি স্মরণীয় ও মর্মান্তিক দিন রয়েছে। যে দিনগুলোর কথা মনে পড়লে শিউরে উঠে পুরো শরীর ও মন। থেমে যায় যেন কর্মচাঞ্চল্য। 'আত-তাহরীক'-এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে উক্ত দু'টি ঘটনাবহুল দিন তুলে ধরতে চাই।

শিরোনামে উল্লিখিত ২২ শে ফেব্রুয়ারী আমার দ্বিতীয় স্মরণীয় দিন। সেকারণ প্রথমটি দিয়েই শুরু করছি।

প্রথম স্মরণীয় দিন :

১৯৯৫ সালের ১৯ শে জুন। বড় সন্তান মারিয়াম ভীষণ অসুস্থ। আমার কামিল পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন। পরীক্ষার বিষয় বুখারী ২য় পত্র। পরীক্ষা দিতে যেতে হবে প্রায় সাত মাইল দূরে। সেজন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তাই অসুস্থ সন্তানকে পার্শ্ববর্তী আমার আম্মার বাসায় রেখে আসি। ক্ষণিক পরই পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বের হয়েছি। ভাবলাম যাওয়ার পথে ছোট্টমণিকে আরেকবার দেখে যাই। কিন্তু আমার আর দেখা হল না। কারণ ইতিমধ্যেই তাকে গোবিন্দগঞ্জ এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য আব্বাকে বললাম, গোবিন্দগঞ্জে মারিয়ামকে দেখে তারপর পরীক্ষার হলে যাব। কিন্তু আব্বার বাধার মুখে এটাও সম্ভব হল না। চলে গেলাম পরীক্ষার হলে।

পরীক্ষার ঘণ্টা বেজে উঠল। হঠাৎ আমার অন্তরটা যেন কেমন এক বিস্ময়ে কেঁপে উঠল। পরীক্ষক খাতা দিলেন। খাতায় নাম ঠিকানা লিখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল, তখন আমার অন্তরে কেমন যেন লাগল। ধারণা করিনি যে, আমার মেয়ের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়, তাই আমার এমন লাগছে। একটু পর প্রশ্নপত্র হাতে পেলাম। কিন্তু তখনও মনের অশান্তির কারণে প্রশ্নপত্রের দিকে না তাকিয়ে বাইরে ট্রেন যাওয়ার দৃশ্য ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে দেখছিলাম। তারপর মনের অশান্তি মনে রেখেই কোন রকমে লিখতে শুরু করলাম। ২ ঘণ্টা লেখার পর মন আর স্থির থাকছে না। তাই খাতা বেঞ্চে রেখেই নিজ খেয়ালে বেরিয়ে পড়লাম। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিক্ষক বলছেন, কি ব্যাপার পরীক্ষা শেষ না হতেই চলে যাচ্ছ। বললাম, ভাল লাগছে না। দোতলা থেকে নীচে নেমে যাওয়া দেখে সবাই অবাক। নীচে নেমে গিয়ে আব্বাকে বললাম, বাড়ী চলে যাব। আব্বা বললেন, কেন পরীক্ষা যে এখনো শেষ হয়নি। উত্তরে বললাম, না হল শেষ এই বলে হাঁটতে লাগলাম। একটু হেঁটে এসে কিছু ফল ও মিষ্টি নিয়ে রিকসাযোগে আব্বা সহ বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম। রাস্তার মাঝে সেজ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। ভাইকে দেখে অন্তরটা কেঁপে উঠল। কিন্তু আমার মারিয়ামের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের কথা ধারণা করিনি। বাড়িতে আসার সময় কবরস্থানে অনেক মানুষ দেখেও কিছু মনে করতে পারি নি। কিন্তু দু'চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু ঝরছে। যখন নিকট পৌঁছলাম, দেখি অনেক মানুষ আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করছে।

রাস্তার পাশেও বহু মানুষের ভীড়। তবুও ধারণা করিনি যে, আমার কলিজার টুকরা নয়নের পুত্তলিকে শুধু আমার জন্য কবরস্থ করতে বাকী আছে। যখন রিকসা থেকে নেমে ভিতরে ঢুকছি তখন সবাই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তবুও আমি কিছুই ধারণা না করে ব্যাগ থেকে জিনিসগুলো বের করছি এবং কলিজার টুকরার কথা জিজ্ঞেস করছি। তখন সবাই আমাকে ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি, এভাবে আমাকে সবাই ধরছে কেন? আমার মারিয়াম কোথায়? মেডিক্যাল থেকে আসেনি? তখন সবাই আমাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বাতাস করছে এবং বলছে, সে তোমাকে ছেড়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। মেয়েটার বয়স তখন চার বছর দু'মাস চলছিল। একটু পর আমাকে শুধু চোখের দেখা দেখিয়ে তাকে কবরস্থানে নিয়ে চলে গেল। সত্যিই এটি আমার জীবনের স্বজন হারানো বেদনার অশ্রুসিক্ত একটি স্বরণীয় দিন!

দ্বিতীয় স্মরণীয় দিন :

২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ সাল। অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিন আবু মারিয়ামের জালসা ছিল রাজশাহী যেলার তাহেরপুরে। বেলা তিনটার সময় গাড়ি আসল তাকে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেদিন বাড়ীর নির্মাণ কাজে লেবার-মিস্ত্রীদের সাথে ব্যস্ত থাকায় তাহেরপুর না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে গাড়ি ফিরিয়ে দেন। গাড়ি ফিরিয়ে দিলে কি হবে? আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন তাকে এভাবেই রক্ষা করেন। সন্ধ্যার একটু আগে তাহেরপুর থেকে একজন লোক এসে তাকে নিয়ে যান। এদিকে রাত্রি ঘনিয়ে আসল। রাতের যাবতীয় কাজ সেরে বাচ্চাদের শুইয়ে দিলাম। আমার ভাতিজা ১৬/১৭ বছরের আব্দুর রহমান সেদিন আমাদের বাসায় ছিল ।

রাত তখন ২-টা হবে। হঠাৎ কে যেন জানালায় এসে করাঘাত করছে এবং বলছে, আব্দুর রাযযাক আছে? শুরু হল ২২শে ফেব্রুয়ারীর সেই চাঞ্চল্যকর হৃদয় বিদারক লোমহর্ষক ঘটনাটি। অন্তর ছিল ঝুলন্ত চাঞ্চল্যময় উদাসীন। তার উপর গভীর রাতের গম্ভীর আওয়াযের করাঘাত 'আব্দুর রাযযাক আছে?' আমার অন্তরে ভয় শুধু চোর-ডাকাতের। কারণ বাড়িতে পুরুষ মানুষ না থাকার কথা শুনে যদি ওরা আরও ক্ষিপ্ত হয়। তাই উত্তর না দিয়ে বললাম, আপনারা কারা? তারাও আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলছে, এটা কি আব্দুর রাযযাকের বাড়ি? উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। ওরা আবার জিজ্ঞেস করল, আব্দুর রাযযাক আছে? আমি পূর্বের মত উত্তর না দিয়ে বললাম, এত রাতে আপনারা কারা? নির্জন নিস্তব্ধ গভীর রাত। চারদিক গুমট অন্ধকার। তাদের হুংকার শুনে একেবারে আতংকিত

ও হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। তবুও সাহস করে বললাম, ভাই আপনারা কারা? দয়া করে সকালে আসুন! কুকুর বুঝে সালামের অর্থ! হুংকার ছেড়ে বরং বলল, দরজা খোল। এবার আরও আতংকিত হয়ে বললাম, ভাই এত গভীর রাতে কেমন করে দরজা খুলব? আপনাদের নিকট অনুরোধ আপনারা সকালে আসুন। যখন তারা আমাকে দরজা খুলতে বলছে, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার একেবারে বিশ্বাস যে, নিশ্চয় এরা ডাকাত-দস্যু ছাড়া কিছু নয়। তাই স্থির না থেকে পূর্ব পার্শ্বের একটি জানালা খুলে পাশের বাসার ছোট ছেলে শাকিলের নাম বলে দু'ডাক দিতেই জ্ঞান ফিরল, আমি কেন চিৎকার করব? যেদিন থেকে বাসা মেরামতের কাজ শুরু হয় সেদিন থেকে একখানা ভাঙ্গা টিন ঘরে রাখি এ কারণে যে, যদি কোন চোর-ডকাত আসে তাহলে তো আমি চিৎকার করতে পারব না। তখন ঐ টিন সজোরে আঘাত করলে প্রতিবেশীরা শুনতে পাবে এবং এগিয়ে আসবে ।

ইতিমধ্যে প্রাচীর ডিংগিয়ে দু'জন লোক ভিতরে চলে এসে দরজা-জানালা উন্মুক্ত পৃথক একটি রুমে ঘুমন্ত ছেলেদের উঠিয়ে বলছে, এটা কি আব্দুর রাযযাকের বাড়ি? ছেলেরা উত্তরে বলছে, হ্যাঁ। তখন আবার আমার ভাতিজাকে বলছে, এই তুমি কি আব্দুর রাযযাক? ভাতিজা উত্তরে বলছে, না আমার নাম আব্দুর রহমান। আমি ওনার সম্বন্ধীর ছেলে। এদিকে আমি আমার মনের পরিকল্পনা অনুযায়ী জানালা খুলে টিনখানা জালানায় ধরতেই দেখি অসংখ্য কালো পোষাকধারী লোক পুরো বাড়িটি ঘিরে আছে? টিনখানা জানালায় ধরে বেদমভাবে পিটাতে লাগলাম, লোকগুলো বলল, আওয়ায বন্ধ কর। তখন ঐ জানালা ছেড়ে উত্তর দিকের জানালা খুলে টিন জানালায় ধরে পিটাতে লাগলাম। এদিকেও একই দৃশ্য। চতুর্দিকে মনে হচ্ছে যেন কাল ছায়ায় ছেয়ে গেছে। দু'দিকের জানালা খুলে জোরে টিনের আঘাত করার পরও কোন দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নিরাশ হয়ে টিন ফেলে দিয়ে আল্লাহকে ডাকলাম, মা'বূদ এই মুহূর্তে তুমি ছাড়া আমার রক্ষা করার আর কেউ নেই'। ভিতর থেকে আব্দুল্লাহকে বলছি, বাবা তোমার সাখাওয়াত চাচাকে একটু ডাক। কেন এত লোকজন ভিড় করছে? বিষয়টা কি একটু জেনে দেখুক। ছেলে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকেও বাধা দেওয়া হয়। ভাতিজা আব্দুর রহমানকে বলছে, গেইটের দরজা খোল। সে উত্তরে বলছে, তালা মারা আছে, আমার কাছে চাবি নেই, কেমন করে খুলব? কোথায় চাবি নিয়ে আয়! এরি মধ্যে এরা বাউন্ডারী গেইটে কি দিয়ে যেন খুব জোরে আঘাত করে দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। যে

আওয়ায বহু দূর হতেও শোনা যাবে। কিন্তু হায়! এত জোরে আঘাতের পরও কোন দিক থেকে লোকজনের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কেউই বলে না যে, কি হয়েছে? এতটুকু শুনতে পেলেও হয়ত মনে শান্তনা আসত। এদিকে বড় ছেলে আব্দুল্লাহ বলছে, আম্মা চাবি দেন, নইলে ওরা দরজা ভেঙ্গে ফেলবে ।

অতঃপর দরজা খুলে দিলে সবাই বাড়ীর ভিতরে চলে আসে। তখনও আমার রুমের দরজা খুলিনি। আমার নয়নমণিদের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে ডাকছি। ওরা তখন আমার রুমের দরজা খুলার জন্য বলছে। আতংকিত মনে ভাবছি, চোর-ডাকাত হলে কথা হবে ভিন্ন ধরনের। কিন্তু এরা শুধু আব্দুর রাযযাককে নিয়েই ব্যস্ত। বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছে, আব্দুর রযযাক কোথায়? উত্তরে ওরা বলছে, তাহেরপুর গেছেন। কখন আসবে? সকালে। সবাই মিলে দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে, দরজা খোল নইলে আমরা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করব। এদের ভাব-ভঙ্গি দেখে বুঝলাম, এদেরকে দরজা খুলে দিতেই হবে। অন্যথা জোর পূর্বক ঘরে প্রবেশ করলে হয়তবা পশুর মত আচরণ করতে পারে। সেই ভয়ে বিবি সারার কথা স্মরণ করে আল্লাহকে ডাকলাম, 'হে আল্লাহ! তুমি বিবি সারাকে যেমনভাবে যালেম বাদশাহর হাত থেকে রক্ষা করেছিলে তেমনি আমাকেও রক্ষা কর'। এদিকে আব্দুল্লাহ বলছে, আম্মা দরজা খোলেন। আল্লাহ আছেন কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ। কচি বাচ্চার এরূপ কথা শুনে অন্তরে একটু সাহস হল। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। পাল্টা আমি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বু তুমি কি এই লোকগুলোকে চিনতে পেরেছ? ছেলে উত্তরে বলল, হ্যাঁ আম্মা, এরা হচ্ছে 'র‍্যাব' (RAB)।

এক জায়গায় দশজন লোক থাকলে তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ দু'টিই থাকে। তাই এদের মধ্যে একজন লোক খুব বদমেজাযী ছিল। যার হুংকারে বাড়িঘর কেঁপে উঠছিল। একজন অবশ্য বলছে, আপনি দরজা খুলুন আমরা আপনার কোন ক্ষতি করব না। আমরা শুধু দেখব ঘরে কেউ আছে কি-না? তখন আমি বললাম, ভাই আপনারা কি সরকারী লোক? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আমরা সরকারী লোক। তখন আমার একটু সাহস হল যে, সাধারণত সরকারী লোকেরা কোন ক্ষতি করে না। অতঃপর বোরকা পরে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে দরজা খুলে দেই। দরজা খুলতেই ঐ বদমেজাযী লোকটি বলছে, তুমিই মনে হয় এ দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় হুযুর। অন্যদিকে তাদের মধ্যে অল্প বয়সী একজন বলছে, আপনি বের হয়ে এসে এখানে দাঁড়ান। আমরা আপনার কোন

ক্ষতি করব না। আমরা শুধু দেখব ভিতরে কেউ আছে কি-না? ভদ্রলোকের কথামত এসে এক পার্শ্বে দাঁড়ালাম ।

আমি বের হয়ে আসার পর ৪/৫ জন র‍্যাব ভিতরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করলাম, কি খুঁজছেন? উত্তরে বলল, সন্ত্রাসী খুঁজছি। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম? কেমন সন্ত্রাসী? উত্তরে বলল, বড় ধরনের সন্ত্রাসী। বিন্দুমাত্রও কল্পনা করিনি যে, আমাদেরকেই সন্ত্রাসী বলছে। ঘরের ভিতরে ঢুকে খাটের উপর-নীচ, আনাচে-কানাচে সর্বত্র তন্ন তন্ন করে দেখল। এমনকি টেবিলের উপর একটি সাধারণ ফাইল ছিল সেটিও দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আব্দুর রাযযাক কোথায়? বললাম, তাহেরপুরে গেছেন। কখন আসবে? সকাল ৭/৮-টার দিকে, আপনারা সকালে আসলেই তার সাক্ষাৎ পাবেন। অথচ আমি জানি যে, তিনি রাতেই আসবেন। কিন্তু তাদের প্রশ্নের উত্তরে কেন যেন সকালের কথা বেরিয়ে আসল! আসলে তাদের হাত থেকে আল্লাহ তাকে এভাবেই রক্ষা করবেন। তাই এরকম উত্তর মুখ দিয়ে বের হয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে তারা ওয়ারলেস করে জানাল যে, এখানে সব নেগেটিভ, আব্দুর রাযযাক বাসায় নেই, তাহেরপুর গেছেন। বাসায় আছে তার সম্বন্ধীর ছেলে এবং স্ত্রী-পরিবার।

অতঃপর ভোর চারটার সময় আবু মারিয়াম আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ তাহেরপুর থেকে ফিরে আসলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা জানার জন্য সকালে থানায় যাবেন বলে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু একটু পর ফজরের ছালাতে মসজিদে গিয়ে শুনতে পান যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে অদ্য রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তখন ধারণা করা হল যে, এহেন উত্তম গুণের অধিকারী, নিষ্কলুষ ও মহৎ ব্যক্তিবর্গকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছে, তখন অবশ্যই কোন জটিল সমস্যা রয়েছে। তারপর তিনি থানায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মুসাফির হিসাবে বাড়ি হতে বের হন ।

উপরের ঘটনা থেকে অবশ্যই কিছুটা হলেও সে সময়ের কঠিন পরিস্থিতির কথা আঁচ করা যায়। এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিষ্ঠান অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। অভিভাবক না থাকলে যা হয়। আশে পাশের মানুষও বিরূপ ধারণা করতে লাগল। এই মাদরাসায় ছাত্রী দিলে ঝামেলা হবে, এই ভয় প্রায় সব অভিভাবকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অনেকেই ছাত্রী সরিয়ে নিলেন। একদিকে অভিভাবকহীন প্রতিষ্ঠান অন্যদিকে ছাত্রীদের চলে যাওয়া। সব মিলে মনে হল,

প্রতিষ্ঠান চালু করে যেন অথৈ সমুদ্রে ঝাপ দিয়েছি, হাবডুবু খাচ্ছি কোনই কূল-কিনারা খুঁজে পাই না। সাতার কেটে কিনারায় উঠব কিন্তু দক্ষ সাতারু নেই। তবুও মনোবল হারালাম না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র বান্দারা মনোবল হারাতে পারে না। মন শক্ত করে সিদ্ধান্ত নিলাম, যে কোন মুল্যে কিনারায় যেতেই হবে। শুরু করলাম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার সাথে এক নতুন যুদ্ধ। যে যুদ্ধের পাথেয় শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা। তার রহমত ও দয়া।

কষ্টের দিনগুলো :

নেই কোন বেঞ্চ, নেই কোন চেয়ার-টেবিল। শুরুর দিকে মেঝেতে পলিথিনের কাগজ বিছিয়ে ক্লাস চালানো হয়। কয়েকদিন পর আবার সেই পলিথিনটি হারিয়ে যায়। মহিলা মাদরাসার সামান্য এ জিনিসটি আমাদের কাছে যে কত মূল্যবান ছিল তা হয়তোবা ঐ চোরেরা জানত না। শ্রেণীকক্ষ বর্ষাকালে পানিতে ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে থাকত। মাটিতে পা রাখার রুচি হত না। পলিথিন হারিয়ে যাওয়ার পর শপ (মাদুর)-এর ব্যবস্থা করা হল। অন্যদিকে গরমের সময় টিনের চালের নীচে ভ্যাঁপসা গরম। মাদরাসার টাকাও নেই যে ফ্যান কিনব। ফ্যান কিনলে রাখবই বা কোথায়? আমাদের তো ইটের প্রাচীর নয় চাটাইয়ের বেড়া। চোরের যেখানে একটা সামান্য পলিথিন সহ্য হয়নি সেখানে ফ্যানের নিরাপত্তার আশা করা দূরন্ত। এছাড়াও আমাদের ছিল না কোন টয়লেট, ছিল না কোন টিউবয়েল।

সুধী পাঠক! কল্পনা করতে পারেন? বিংশ শতাব্দীতে এমন একটা প্রতিষ্ঠান, যা চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা, মাথার উপর টিনের চাল, স্যাঁত স্যাঁতে মাটি, শিক্ষিকাদের বসার চেয়ার নেই, ছাত্রীদের বসার বেঞ্চ নেই, গরমে ফ্যান নেই। শুধু তাই-ই নয়, যেখানে সামান্য পানি পানের ব্যবস্থা নেই, মানুষের মানবিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য কোন টয়লেটের ব্যবস্থাও নেই, সেখানে ক্লাস করা এবং করানো কতটা কষ্টের হতে পারে? আজ ভাবলে গা শিউরে উঠে। চোখে পানি আসে। হৃদয় উচ্ছসিত অব্যক্ত কষ্ট অজান্তেই দু'ফোটা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ে। অস্ফুট কণ্ঠে বের হয়ে আসে 'আল-হামদুলিল্লাহ'।

আর্থিক সংকট :

কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মেরুদণ্ড হল অর্থ। কিন্তু সেটাও ছিল শূন্যের কোটায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে অর্থনৈতিক কারণে বার বার হিমশিম খেতে হচ্ছিল। চাটাইয়ের বেড়া দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। কখনো বছরে একবারও মেরামত করতে হয় আবার কখনো কখনো দু'বারও করতে

হয়। মাদরাসাকে কেউ চিনে না, যাতে করে মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করবে। এছাড়া সে সময় দেশের মানুষের দানে মাদরাসা চলবে এ ধরণের চিন্তাও অনেকের মাঝে ছিল না। প্রায় সবাই বিদেশী অনুদান নির্ভর ছিল। কিন্তু স্মরণীয় ২২ ফেব্রুয়ারীর পর সে সব অনুদান টোটালি বন্ধ। ফলতঃ নওদাপাড়ায় ছেলেদের মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন প্রায় তিন বছরের বকেয়া হয়ে যায়। এছাড়া বিদ্যুত বিল, চাউল বিল সহ অনেক টাকা বকেয়া হয়ে যায়। সে সময় আমাদের মহিলা মাদরাসার অবস্থার কথা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের সম্বল বলা চলে, শুধুমাত্র ছাত্রীদের বেতন ফী। সেটাও তো বেশি নয়, সামান্য ২০ টাকা ভর্তি ফি আর ১০ টাকা মাসিক বেতন। এতে আবার কি হয়? তার মধ্যে আবার তিন জনের ২ জনই ফ্রি।

উত্তোরণের চেষ্টা :

একদিকে শিক্ষিকা সংকট অন্যদিকে মাদরাসার অর্থনৈতিক অবস্থা করুণ। অবস্থা দেখে আমি দুইভাবে এই সংকট থেকে উত্তোরণের চেষ্টা করলাম।

প্রথমতঃ আমি আবু মারিয়াম আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবকে পরামর্শ দিলাম। তার পরিচিতদের কাছে মাদরাসার কথা বলতে। আমার উৎসাহে সাহস করে তিনি যতটুকু সম্ভব মানুষের নিকটে মাদরাসার কথা বললেন। তার কথায় সাড়া দিয়ে অনেক সহৃদয়বান ব্যক্তি এগিয়ে আসলেন। সেই সময় তিনি দুই একজন হাতে গোণা মানুষের নিকট থেকে যে সহযোগিতা নিয়ে আসতেন তা প্রয়োজনের তুলনায় যদিও ছিল অপ্রতুল। তারপরেও ডুবতে থাকা মানুষের জন্য আশ্রয় হিসাবে একটা খড়-কুটা অনেক কিছু।

স্মর্তব্য যে, পরবর্তীতে মহান আল্লাহ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের হাতে এত বরকত দিলেন যে, কোনরূপ বিদেশী সহযোগিতা ছাড়াই তার ৫ বছরের প্রধান শিক্ষকতার যুগে নওদাপাড়ার তিন বছরের সব বকেয়া বেতন ও বিল পরিশোধ করে দেন। প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ করে পশ্চিম পার্শ্বের বিল্ডিং তিনতলা পূর্ণ করে ৪ তলা করেন এবং পূর্ব পার্শ্বে তিন তলা সম্পূর্ণ করেন, যা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ আমি মাদরাসার প্রতি এলাকাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কচিকাচা ছাত্রীদের নিয়ে প্রথমবারের মত 'ইসলামী সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। এলাকার সকল মহিলাদের দাওয়াত দিয়ে জমায়েত করি। শিশু, ১ম, ২য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখে বিভিন্ন দু'আ, কুরআন তেলাওয়াত,

কুরআনের তরজমা ও 'ভাঙ্গা মাদরাসা' নামে একটি নাটিকা পেশ করেছিলাম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের পারফরমেন্স এলাকাবাসীর নযর কেড়ে নেয়। তারা খুশি হয়ে কেউ একটি বাঁশ, কেউ বা পাঁচ কেজি ধান, কেউ ২ টাকা হতে শুরু করে ১০০ টাকা পর্যন্তও দান করেছেন। এভাবে কোন হালাতে শিক্ষিকাদের জন্য প্রথমবারের মত মাত্র ৫০০/= টাকা বেতনের ব্যবস্থা করি। সাথে সাথে মাদরাসা মেরামত সহ প্রথমবারের মত কিছু বেঞ্চেরও ব্যবস্থা করি। উল্লেখ্য যে, আমি মাদরাসার তরফ হতে যে ভাতাটুকু পেতাম তা আব্দুর রাযযাক ছাহেব তার সংসারে প্রয়োজন মনে করতেন না। ফলে তাও আমি মাদরাসার কাজে লাগাতে লাগলাম।

'ভাঙ্গা মাদরাসা' নাটিকা :

২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ছোট ছোট সোনামণিদের নিয়ে সর্বপ্রথম একটি ইসলামী সংস্কৃতি ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে এলাকার মহিলাদের দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছিলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে আনজু কমিশনার ও শাহু কমিশনারের স্ত্রী ও আমীরে জামা'আতের স্ত্রী সহ আরও অন্যান্য বহু মহিলাকে দাওয়াত করেছিলাম। গণ্যমান্যদের মধ্যে শুধু আনজু কমিশনার উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদের ছোট্ট সোনামণিদের মুখে সুন্দর কুরআন তেলাওয়াত, বিভিন্ন দু'আ, ইসলামী গান, কুরআন তরজমা, হাদীছ তরজমা, কবিতা আবৃতি, বাংলা সংলাপ, ইংরেজী সংলাপ, আরবী সংলাপ ও 'ভাঙ্গা মাদরাসা' নামে একটি নাটিকা পেশ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান এলাকাবাসীর অন্তর কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবে প্রতি বছর আমাদের অনুষ্ঠান এলাকায় বিশেষ সাড়া জাগাতো। ফলে আমাদের মাদরাসার ভর্তির বিজ্ঞপ্তি মাইকিং ছাড়াই এলাকায় প্রচার হয়ে যেত। 'ভাঙ্গা মাদরাসা' নামে নাটিকাটি নীচে তুলে ধরা হল :

সংলাপের চরিত্র ৫টি :

(১) ছনিয়া (ছদ্মনাম) (২) ছনিয়ার মা (৩) ছনিয়ার বাবা (৪) শিক্ষিকা (৫) ছনিয়ার পড়শী ছাদেকা (ছদ্মনাম)।

(প্রথম দৃশ্য)

ছাদেকার মা আগে থেকেই একটু বেশি ধার্মিক। তাই ছাদেকাকে আগেই মাদরাসাতে ভর্তি করেছে।

ছাদেকা : একা একা বসে সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলওয়াত করছে।

ছনিয়া : তার সুমধুর কুরআন তেলাওয়াত শুনে দৌড়ে এসে বলছে, আপু! তুমি এত সুন্দর কুরআন তেলাওয়াত কোথায় থেকে শিখলে?

ছাদেকা : এই তো এখানে মাদরাসায় আমাদের শিক্ষিকাগণ শিখাচ্ছেন ।

ছনিয়া : তাই! আপু! কুরআন তেলাওয়াত শুনতে আমাকে বেশ ভাল লাগছে। কুরআন তেলাওয়াত করলে কি হয়?

ছাদেকা : একটু আদর দিয়ে বলল, কেন তুমি জান না? কুরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সাক্ষী দিবে।

ছনিয়া : আপু! আমি একটু কুরআন তেলাওয়াত শিখবো। আমাকে একটু শিখাবা?

ছাদেকা : আরে পাগলি আমি কেন শিখাবো? আমার পড়া-শুনা আছে না? আমাদের মাদরাসায় ভর্তি হও তাহলেই শিখতে পারবা।

ছনিয়া : তাহলে আমার আম্মুকে গিয়ে বলি।

[ছনিয়া তার মায়ের কাছে গেল। আম্মু! আম্মু! আমি ছাদেকা আপুদের মাদরাসায় ভর্তি হব। আমাকে ভর্তি করে দাও না! এই বলে সে তার মায়ের সাথে বায়না ধরল]

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

ছনিয়ার মা : কোথা থেকে কোন্ ভেজাল নিয়ে এসে ধরল আমায়! (বিরক্তির সাথে)। কাজ কাম কিছুই হয়নি। যা! এখন যা! তোর বাবা মাঠ থেকে আসুক, তারপর বলে দেখি ভর্তি করবে কি-না।

ছনিয়ার বাবা : মাঠ থেকে ছনিয়ার বাবা এসে ডাকতে লাগল, ছনিয়ার মা! ছনিয়ার মা!! বাড়ি ঘর ছেড়ে কোথায় গেছে? তোমাকে যে খুঁজে পাওয়া যায় না!

ছনিয়ার মা : কি হয়েছে? অত চিল্লা-চেঁচা করছ কেন? একটু টয়লেটে গেছিলাম। টয়লেটে গিয়েও শান্তি নেই। বস! তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বাতাস করব? এই বলে বাতাস করতে লাগলো ।

ছনিয়া : আবার দৌড়ে এসে তার বাবার গলা ধরে বলছে, আব্বু! আমাকে ছাদেকা আপুদের মাদরাসায় ভর্তি করে দাও। আব্বু আমাকে ভর্তি করে দাও! কঠিন বায়না ধরল।

ছনিয়ার বাবা : কোথায়রে ছনিয়ার মা সেই মাদরাসা? এখানে তো কোন মাদরাসা নেই।

ছনিয়ার মা : কেন? ঐ তো ভাঙ্গা মাদরাসা। বেড়া নেই, প্রাচীর নেই। বসার জায়গা নেই। কি করে যে ওখানে সব পড়ে!

ছনিয়ার বাবা : (অনীহার সাথে) না-মা! না! তোকে ঐ ভাঙ্গা মাদরাসায় ভর্তি করাবো না। ওখানে তো বসার জায়গা নেই। পড়ালেখা আবার কিসের? তোকে উন্নতমানের স্কুলে ভর্তি করাবো।

ছনিয়া : আব্বু! না। ওখানে ভাল পড়াশুনা হয়। এই যে ছাদেকা আপু সুন্দর করে কুরআন তেলাওয়াত করা শিখেছে। আমিও ঐ রকম শিখবো। তোমরা যখন মারা যাবে তখন তোমাদের জন্য দু'আ করব। আব্বু! আমাকে ওখানেই ভর্তি করে দাও!

ছনিয়ার বাবা : ছনিয়ার মা! এক কাজ কর! আপাতত মেয়ে যখন শুনছে না, তখন ওখানেই ভর্তি করে আস। পড়াশুনার মান খারাপ হলে অন্য কোথাও ভর্তি করিয়ে দিব।

ছনিয়ার মা : চল! তোকে ভর্তি করে আসি। ছনিয়ার মুখ ও হাত পরিষ্কার করে দিয়ে মা মেয়েকে মাদরাসায় নিয়ে গেল। *কৈ গে! আপনারা কেউ আছেন গে?* (রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষা)।

(তৃতীয় দৃশ্য)

শিক্ষিকাকে দেখে ছনিয়ার মা বলল, আস-সালামু আলাইকুম আপা! আমার মেয়েকে ভর্তি নিবেন?

শিক্ষিকা : ওয়ালাইকুমুস সালাম। আসেন, এদিকে আসেন! আমাদের কোন বসার ব্যবস্থা নেই। দুঃখিত! মাদুরেই বসেন।

ছনিয়ার মা : কত টাকা-পয়সা লাগবে আপা? আমরা তো গরীব-সরিব মানুষ। একটু কম-সম করে ধরেন।

শিক্ষিকা : ভর্তি ফী ৫০ টাকা। মাসিক বেতন ক্লাস ভেদে **১০, ২০ ও ৩০** টাকা মাত্র।

ছনিয়ার মা : আমরা অত কিছু জানি না। এই নেন ৫০ টাকা! আমি ৫০ টাকাই এনেছি। ভর্তি ফী ও মাসিক বেতন মিলে যা হয় নেন। এর বেশী দিতে পারব না।

শিক্ষিকা : ৪০ টাকা ভর্তি ফী ও ১০ টাকা মাসিক বেতন নিলেন এবং বললেন, প্রতিদিন মাদরাসায় পাঠাবেন। একদিন অনুপস্থিত হলে ১০ টাকা জরিমানা বাধ্যতামূলক দিতে হবে। সকাল আটটায় ক্লাস শুরু হয়। ৮টা বাজার আগেই পাঠাবেন। মাঝে মধ্যে খোঁজ নিবেন। আমাদের ড্রেস হচ্ছে, সাদা স্কার্ফ, সাদা পাজামা ও খয়েরি কালারের জামা।

ছনিয়ার মা : আচ্ছা! আপা! আসি তাহলে, দু'আ করবেন!

শিক্ষিকা : আপনারাও আমাদের জন্য দু'আ করবেন। আস-সালামু আলাইকুম।

[দিন যায় রাত্রি যায়। ছনিয়া নিয়মিত মাদরাসায় যায়। শিক্ষিকাগণ পাঠদানের পাশাপাশি উত্তম শিষ্টাচারও শিক্ষা দেন]

(চতুর্থ দৃশ্য)

ছনিয়া একদিন তার বাবার সাথে খেতে বসেছে। তার বাবা বাম হাতে পানি পান করছিল। ছনিয়া উঠে বলল, আব্বু! বাম হাতে খেতে হয় না। বাম হাতে শয়তান খায়। বাবা চমকে গেলেন। খাওয়া শেষে ছনিয়া সুন্দর করে খাওয়া শেষের দু'আ পড়ল এবং আব্বুকেও পড়তে বলল। তার বাবা মেয়ের কথা ও কাজ দেখে অবাক।

ছনিয়ার বাবা : মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, মা তুমি সুন্দর শিখেছ। সত্যি মাদরাসাটি ভাঙ্গা হলেও সেখানে বেশ ভাল পড়াশুনা হয়।

ছনিয়া তখন পিতা-মাতার জন্য দু'আটি সহ আরও বেশ কয়েকটি ছোট ছোট দু'আ শুনালো তার বাবাকে। তার পিতা মনে মনে লজ্জিত হলেন এবং মেয়ের কৃতকার্য দেখে যারপরনাই খুশী হলেন। মেয়ের জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করলেন।

-উম্মে মারিয়াম রাযিয়া

বাধার সম্মুখীন :

ভাল কাজ বরদাশত করতে পারে না এরকম মানুষ সব সমাজেই থাকে। আমাদের প্রতিষ্ঠান যখন ধীরে ধীরে উন্নতির পথে, তখন এলাকার বিভিন্ন মানুষের নানা রকম কথা। কেউ টিপ্পনি কেটে বলে, মলবির বউরা ভাত পায় না তাই সব চাকুরী করার জন্য মাদরাসা খুলেছে। আবার পাশের 'ব্রাক স্কুল'-এর অনেক ছাত্রী আমাদের মাদরাসায় চলে আসায় তাদের পক্ষ হতে চাপ। তারা এসে বলছে, আপনি মাদরাসা খুলে আমাদের স্কুলের ছাত্রী সব নিয়ে আসলেন। আপনার নামে কেইস করে দিব। কেন আপনি আমাদের ছাত্রী নিয়ে আসলেন?

একবার তো জনৈকা মহিলা এসে দাপটের সাথে ক্লাশ হতে ছাত্রী জোর পূর্বক উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকারা কখনো কোন ছাত্রীকে ধমক দিলে বা শিষ্টাচারমূলক হালকা কোন পানিশমেন্ট দিলে কোন কোন স্থানীয় ছাত্রীর অভিভাবক দক্ষিণা ঝাপটা হাওয়ার মত ছুটে আসে। এরকম করে অনেক অভিভাবকই স্থানীয় দাপট খাটিয়ে ছাত্রী মাদরাসা থেকে নিয়ে চলে গেছেন। মাদরাসায় এসে শিক্ষিকাদের অনেক গালি-গালাজ পর্যন্ত করেছেন। শিক্ষিকাদের নিয়ে মুখ বুজে সকল রকমের টিটকারী, বাধা ও হুমকি ধমকি সহ্য করে গেলাম। এভাবেই পার হয়ে গেল আরেকটি বছর।

নতুন বছরে নতুন বিপদ :

২০০৬ সাল। নতুন সাজে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু নতুন বছরেও বিপদ আমাদের পিছু ছাড়ল না। এ বছর শ্রেণী হচ্ছে শিশু, ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৫ম শ্রেণী। উল্লেখ্য, ৪র্থ শ্রেণী নেই। মোট শিক্ষিকা চারজন। কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায়। শরীফা ভাবী মাদরাসায় থাকার বিষয়ে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করলেন। এ ব্যাপারে তিনি তিনটি কারণ পেশ করলেন। যথা-

(১) আমাকে এখানে থাকতে ভাল লাগে না। আমার আপু ঢাকায় থাকেন। আমিও ঢাকায় থাকব।

(২) আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হচ্ছে।

(৩) এই প্রতিষ্ঠান কোনদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। যার কোন হাতা-মাথা কেউই নেই। আমি অযথাই এখানে সময় ব্যয় করতে পরবো না।

শরীফা ভাবীকে অনেক বুঝালাম। শেষ পর্যন্ত তিনি রাযী হলেন না। পরবর্তীতে তিনি অবশ্য দীর্ঘ তিন বছর পর ২০০৯ সালে পুনরায় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। অন্যদিকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন আমাদের আরেক প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষিকা খালেদা ভাবী। বাকী রইলাম শুধু আমি আর ২০০৫ সালে নিয়োগপ্রাপ্তা শিক্ষিকা সাবিহা আপা। বর্তমানে তিনি জুনিয়র সহকারী শিক্ষিকা। এতগুলো ক্লাশের মধ্যে আবার ৫ম শ্রেণীতে ৫ জন ছাত্রী। তাদের ২জন আবার বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। কি করব? 'অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর'-এর মত হয়ে গেলাম। এরকম ঘোলাটে পরিস্থিতিতে শরীফা ভাবীর চলে যাওয়াটা এবং খালেদা ভাবীর দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ হওয়াটা নতুন হিসাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক বড় ধাক্কা ছিল। তারপরেও মহান আল্লাহ্‌র উপর

ভরসা করে তার নিকটেই আকুলভাবে দু'আ করতে লাগলাম, 'প্রতিপালক! এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠানকে তুমি প্রতিষ্ঠা করার মনোবল দাও, সাহায্য কর'-আমীন!!

প্রথম সফলতা :

মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমতে যে দু'জন ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তারা দু'জনেই ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে থানা পর্যায়ে ১ম স্থান এবং ২য় স্থান অধিকার করে। সেই উপলক্ষে ২০০৭ সালের শুরুতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করি। উক্ত অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করা হয়। যেখানে সর্বাধিক সহযোগিতা করেন 'আত-তাহরীক' পত্রিকার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সেই সময়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ছাহেবকেও দাওয়াত করা হয়। আমি সেই অনুষ্ঠানে মাদরাসার পক্ষ হতে লিখিতভাবে একটি বক্তব্য পেশ করি। সেই বক্তব্যে মাদরাসার মর্মান্তিক অবস্থা এবং পাঠদানের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। উক্ত বক্তব্য ফটোকপি করে বিভিন্ন জায়গায় বিতরণও করেছি পরে। (বক্তব্যটি শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে)।

নতুন জমি :

আমাদের অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান যে মসজিদে চলত সেখানে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় কমিটির সদস্যগণ মিলে মসজিদের পাশে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে একটি পানির ডোবা ক্রয় করেন এবং বালু দিয়ে ভরাট করে তার উপর ক্লাস রুম নির্মাণ করেন।

আবাসিক সংকটে কাটানো শিক্ষিকাদের সেই দিনগুলো :

শিক্ষিকা সংকট দূর না করলে সামনে ক্লাস বাড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অগত্যা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব বাহির হতে দু'জন শিক্ষিকা নিয়ে আসলেন। কিন্তু তাদের কোন থাকার ব্যবস্থা নেই। বাহির হতে আসা শিক্ষিকাদের বেতন মাত্র ১৫০০/- টাকা। এত স্বল্প টাকায় বাড়ি ভাড়া করে, বিদ্যুৎ বিল দিয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। মাদরাসার স্বার্থে কষ্ট মাথা পেতে নিতে তৈরি হলাম। তাদের থাকার ব্যবস্থা হল আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের বাসায়। প্রাথমিকভাবে কিছুদিন তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও আমি নিজ হাতে করি। বেশ কিছুদিন আমি তাদের রান্না করে খাওয়াই। পরে তারা নিজেরা রান্না করে খাওয়া শুরু করেন। এভাবে প্রায় ছয় মাস পার হয়ে

গেল। উক্ত বেতন একেবারেই কম হওয়ায় একজন শিক্ষিকা চলে গেলেন। অপরজন বর্তমানে হাফেযা শিক্ষিকা সুফিয়া আপা থেকে গেলেন।

ক্ষমতাশীলদের দাপট :

প্রতি বছর মাদরাসার চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে ঘিরতে অনেক টাকা খরচ হয়। তাই চতুর্দিকে ইট দিয়ে ঘেরার চিন্তা-ভাবনা করা হল। যদিও ঐ সময়ে ইট দিয়ে ঘেরার চিন্তা-ভাবনা করা আকাশ কুসুম কল্পনার ন্যায়। তারপরও আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব সাহস করে আগের দিকে পা বাড়ালেন। ভাগ্যের কি পরিহাস! মাদরাসায় পিছনের জমি ওয়ালার সাথে কী যে হল! আর ঘেরা হল না। এবার সেটা মিটিয়ে আবারও পদক্ষেপ নিলেন। এবার হল আর এক মজার কাণ্ড। যেমন-

মাদরাসার সামনে দিয়ে যে রাস্তা সেটা তিনফুট প্রশস্ত। তাই আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব তিন ফুট রেখে ঘিরবেন। কিন্তু মাদরাসার যিনি পড়শী তিনি ছয় ফুট রাস্তা নিবেন। আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব ও সম্পাদক ছাহেব তা দিবেন না। অন্যদিকে পড়শীর স্ত্রী ও শামসুল মাস্টার ছাহেব ছয় ফুট রাস্তার বিষয়ে একমত। মীমাংসা হয়ে চার ফুট রাস্তা রেখে কাজ শুরু হল। তাতেও পড়শীর স্ত্রী একমত হতে পারলেন না। তিনি তখন স্থানীয় কমিশনারের নিকটাত্মীয়র কাছে গিয়ে কী যে বললেন আল্লাহই ভাল জানেন। কমিশনার ও তার আত্মীয়রা স্থানীয়ভাবে প্রচণ্ড প্রভাবশালী লোক ছিলেন। বেলা দু'টার ছালাতের পর আচমকায় তারা এসে মিস্ত্রিদের কাজ বন্ধ করে দিল। শুরু হল অকথ্য সব কথা ও হুমকি-ধমকির এক আকস্মিক কাল বৈশাখী ঝড়। কলমের ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঐদিন আব্দুর রাযযাক ছাহেব বাসায় ছিলেন না। সম্পাদক ছাহেবও ছিলেন না কিন্তু শামসুল মাষ্টার ছাহেব ছিলেন। আমি ছেলেদের বলে পাঠালাম, তোমার স্যারকে গিয়ে বল যে, তিনি যেন একটু বের হয়ে দেখেন। কিন্তু তিনিও ভয়ে বের হলেন না। শেষ পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকল। ঐদিন বিকেলে আমার বড় ছেলে আব্দুল্লাহ প্রায় ১০/১১ বছরের ছেলেকে বিষয়টি খুলে বলে তাদের চেম্বারে পাঠালাম। ছেলে সেখানে গিয়ে দেখে সম্পাদক ছাহেব সেখানে বসে আছেন। আমার ছেলেকে দেখে তিনি বললেন, কি খবর আব্দুল্লাহ তুমি এখানে কেন? ছেলে তখন বিষয়টি খুলে বলেছে যে, আম্মা পাঠিয়েছে। তখন তিনি বলেন, আচ্ছা তুমি যাও আমি দেখছি। এই বলে তিনি আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। পরে সম্পাদক ছাহেব তাদের সাথে বসে বিষয়টি মীমাংসা করেন। অতঃপর পুনরায় কাজ শুরু হয়।

জমি কিনে ক্লাস রুম বাড়ানো :

ক্রমান্বয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। সুতরাং শ্রেণীকক্ষও বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু টাকা-পয়সা নেই। কি করা যায়? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে প্রাথমিকভাবে আমার রান্না ঘরের ও বৈঠক ঘরের টিন খুলে নিয়ে ছাত্রীদের দু'টি শ্রেণী কক্ষের ব্যবস্থা করে হাফ ছাড়লাম। কিন্তু জায়গা একেবারেই কম হওয়ায় খুব কষ্টকর হয়ে গেল। আমি আব্দুর রাযযাক ছাহেবকে বললাম, যদি আপনারা সবাই জেল-হাজতে বন্দি হয়ে যান তাহলে এইভাবে প্রতিষ্ঠান চালানো যাবে না। তবে যদি একটু জায়গা থাকে, তাহলে আমি যেভাবেই হোক প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। সব সময় এক রকম পরিবেশ থাকবে না। আল্লাহ কোন একটা ভাল ব্যবস্থা করবেনই ইনশাআল্লাহ। পাশেই এক লোক জমি বিক্রি করবেন জানতে পেরে আমি আব্দুর রাযযাক ছাহেবের সাথে বায়না ধরলাম। নীচু জমি তাই তিনি কিনবেন না। আর আমিও নাছোড়বান্দা। তাকে অনেক ভাবে বুঝালাম। অবশেষে রাযী হলেন। কিন্তু জমি কেনার কথা ছিল ৯ কাঠা। জমিটা শামসুল মাস্টার ছাহেবের বাসার সাথে হওয়ায় তিনিও কিছু নেওয়ার প্রস্তুতি নিলেন এবং আব্দুর রাযযাক ছাহেবকে অনুরোধ করলেন। ফলতঃ আমাদের আর ৯ কাঠা নেওয়া হল না। জমি নেওয়া হল ৬ কাঠা। সেই জমিতে বালু ভরাট করে সেখানেই চারটি ক্লাস রুম করা হল। ফালিল্লাহিল হামদ্।

হায়রে টয়লেট!!

এভাবে ক্লাসরুম কোন রকম হল, কিন্তু এতগুলো বাচ্চার কোন টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। নেই কোন খাওয়ার পানির সুব্যবস্থাও। ছাত্রীদের কি যে দুরাবস্থা ও কষ্ট!! সেটা ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যাবে না। মাদরাসার পশ্চিম কোনায় ক্লাস রুমের সাথে একটু টয়লেটের জায়গা করা হল। কিন্তু তার দুর্গন্ধে ক্লাসে থাকা যায় না। তাই সামনের দিকে টিউবওয়েলের পাশে কোন রকমে টয়লেটের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু তার দরজার ব্যবস্থা করা গেল না। আমি বাসার দরজার পর্দার কাপড় খুলে নিয়ে গিয়ে টয়লেটের দরজায় লাগালাম। কিছু দিন যেতে না যেতেই এক ছুটিতে সেটা হারিয়ে গেল। এবার আমার বাসার টিউবওয়েলের উপর ছায়া করার জন্য কয়েক খানা টিন দিয়েছিলাম, তার একখানা টিন খুলে নিয়ে টয়লেটের দরজা বানালাম। কিন্তু কী যে ব্যাপার! আর এক ছুটিতে সেটাও হারিয়ে গেল। এবার আবার একখানা পর্দা খুলে নিয়ে গিয়ে টয়লেটের দরজায় লাগালাম। এই পর্দাটি শেষ পর্যন্ত ছিল।

পানির টিউবওয়েল :

খাওয়ার পানির ব্যবস্থা নিয়ে অনেক টেনশনে ছিলাম। ছাত্রীরা আশেপাশের বিভিন্ন বাসায় গিয়ে পানি খেয়ে আসে। কেউ বাসা থেকে বোতল ভর্তি করে পানি আনে। এভাবে কষ্ট করে আর কতদিন চলে? মহান আল্লাহ রহম করলেন। ২০০৬ সালের অনুষ্ঠানে পাঠ করা আমার লিখিত বক্তব্য এক মহিলাকে দেখিয়েছিলাম। তিনি পরবর্তীতে ৩০০০/- (তিন হাযার) টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু টাকা জমা করে শামসুল মাস্টার ছাহেবের হাতে দিলাম। তিনি টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করলেন। এভাবে শ্রেণী কক্ষ, খাওয়ার পানি ও টয়লেটের অসুবিধা দূরীভূত হল। আল-হামদুল্লিাহ।

আবাসিকের দুঃখগাথা :

২০০৭ সালের শেষের দিকে আবাসিক ছাত্রী রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল। রাস্তার পাশে একটি টিনসেট বাসা আছে, যা 'বিস্কুট ফ্যাক্টরী' নামে পরিচিত। সেই বাসাটি ভাড়া নেওয়া হল। বাবুর্চি হিসাবে নির্ধারণ করা হল আমার পড়শী মমতাজ বেগমকে। বর্তমানে তিনি মাদরাসার পিয়ন। পাঁচ কেজি চাল ধরবে এমন মাপের হাড়ি-পাতিল কেনা হল। কিন্তু ছাত্রী ভর্তি হল শুধুমাত্র একজন। তাও আবার তৃতীয় শ্রেণীতে। বাড়ি দিনাজপুর। নাম আঙ্গুরা। তার নাম পরিবর্তন করে রাখলাম আমেনা। ছাত্রী একজন হওয়ায় তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল আমার বাসায়।

২০০৭ সাল হতে একজন শিক্ষিকা তার একটা বাচ্চা সহ আমার বাসাতে আছেন। এখন ২০০৮ সালে একজন ছাত্রী। তাদের থাকা-খাওয়া সবকিছু আমার বাসায়। ফালিল্লাহিল হামদ্। বেশ কিছুদিন অতিক্রম হলে আরও দু'জন ছাত্রী ভর্তি হল ৫ম শ্রেণীতে। আবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দু'জন শিক্ষিকা নেওয়া হল। এবার ছাত্রী হল তিনজন। শিক্ষিকাও তিনজন। উক্ত ভাড়াকৃত বাসায় সবার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। মানুষের তুলনায় পাতিল হল অনেক বড়। তাই আমার বাসা হতে আমার ব্যবহৃত হাড়ী-পাতিল, পেশার কুকার, কড়াই এক কথায় যাবতীয় কিছুর ব্যবস্থা করলাম।

সহকারী শিক্ষিকা সাবিহা আপা ও খালেদা ভাবীর সাথে পরামর্শ করে বাবুর্চিকে বললাম, (কাকী বলে সম্মোধন করতাম) কাকী! তাবলীগী ইজতেমায় যদি দু-চার জন ছাত্রী ভর্তি হয়, তাহলে তোমাকে রেখে দিব আর যদি না হয়, তাহলে

তোমাকে রাখতে পারছি না। ইজতেমা শেষ হয়ে গেল। কোন ছাত্রী ভর্তি হল না। তাই তাকে বিদায় করে দিলাম। ভবিষ্যতে মাদরাসা বড় হলে পিয়ন পদে নিব বলে আশ্বাস দিলাম। এবার রান্নার পালা আসল শিক্ষিকাদের উপর। শিক্ষিকাগণ নিজ হাতে রান্না করে খান এবং ছাত্রীদের খাওয়ান। কিন্তু খুব কষ্ট। টিনের ছাপড়া ঘর। একেতো প্রচণ্ড গরম অন্যদিকে খড়ির চুলায় রান্নার ধোঁয়া। গরম ও ধোঁয়ায় টিকা যায় না। উপরন্তু টিউবওয়েলের পানি চেপে সব কাজ করতে হয়। পাতিলের কালি, ধোঁয়া, রান্না-বান্নার পানি, গোসল ও কাপড় কাঁচার পানি সব কিছু শিক্ষিকাদের নিজহাতে করতে হয়। সে কষ্টের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। যে তিনটা বাচ্চা ভর্তি হয়েছে তারা সবাই বেশ ভাল পরিবার থেকে এসেছে। তাদের কান্নাকাটির শেষ নেই। কে তাদের চুপাবে? মাঝে মাঝে আমার বাসায় নিয়ে এসে, বিভিন্ন খাবার দিয়ে, কম্পিউটারে ইসলামী গযল চালু করে দিয়ে, বিভিন্ন ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে রাখতাম। এভাবে যখনই কোন নতুন বাচ্চা এসে ভর্তি হত, তখনই তাদেরকে সান্তনা দেওয়া লাগত। কেননা তারাই ছিল তখন মাদরাসার ভরসা।

ভাল আবাসিকের স্বপ্ন :

এবার প্রতিষ্ঠান কোন হালাতে হলেও দাঁড়াতে পেরেছে। কিন্তু আবাসিক নিয়ে খুব কষ্ট। ভাষায় প্রকাশ করার নয়। কোন ভাল ব্যবস্থা করাও যায় না। এটা এমন নয় যে, ক্লাশরুম ফুঁ দিয়ে চাটাই খাড়া করে দিলাম আর হয়ে গেল। একদিন একটা আভাস পেলাম, সঊদী প্রবাসী আব্দুর রশীদ সিলেটী ছাহেব তার বাসার একটা ফ্লাট ভাড়া দিবেন। উল্লেখ্য যে, তার বাসাতেই সম্পাদক ছাহেব থাকেন। এখানেই আমাদের প্রথম ক্লাস চালু করা হয়েছিল। আমি তার দেশে আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি দেশে ফিরে আসলেন। আমাদের বাসায় দাওয়াত দেওয়া হল। খাওয়া শেষে আব্দুর রাযযাক ছাহেবের সাথে বাসা ভাড়া নিয়ে কথা উঠল। জানি না দু'জনের মাঝে কি হল। আব্দুর রাযযাক ছাহেব মেহমান রুম হতে বাহির হতেই চেহারা দেখে অনুমান করলাম, হয়তোবা বাসা ভাড়া নেওয়া হল না। আমার ধারণা সঠিক হল। বাসা ভাড়া নেওয়া হল না। আমি আব্দুর রাযযাক ছাহেবকে এ বিষয়ে কারণ জিজ্ঞেস করতেই তিনি আমার প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করলেন। আমি আর কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। তবে স্পষ্ট হলাম যে, বাসা ভাড়া নেওয়া হয়নি।

পরের দিন আবার আমাদের স্বপরিবারে দাওয়াত দিয়েছেন সম্পাদক ছাহেব। এবার ভাবলাম দেখি আব্দুর রশীদ ছাহেবের স্ত্রীর নিকট আমাদের দুর্দশার কথা বলে কোন পথ করতে পারি কি-না? দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখি, সবাই আমরা এক সাথে। শরীফা ভাবী, খালেদা ভাবী, মাহমূদা ভাবী সবাই আছেন। আমি ভাবলাম, কিভাবে বলি? সবার সাথে বলে কাজ হয় কি-না? কিসের খাওয়া-দাওয়া। আমার খেয়াল শুধু কখন তাকে একটু একা পাই। আল্লাহ সুযোগ করে দিলেন। সুযোগ পেয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আমাদের দুর্দশার কথা প্রকাশ করলাম। নিজেকে অনেক ছোট মনে করে প্রতিষ্ঠানের খাতিরে তার হাত ধরে অনুরোধ করলাম। তিনি আমার কথা কতটুকু বুঝতে পারলেন জানি না, কারণ তিনি সিলেটের মানুষ। এটুকু বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমার বিষয়টা ভাইকে বলবেন। পরের দিন ওনাদের বিদায়ের পালা। মন খুব আনচান করছে। আল্লাহ! আমার কাজ হল কি হল না! পরের দিন আমার বড় ছেলে এসে বলছে, আম্মা সম্পাদক চাচা আমাকে বললেন, তোমার আম্মা মনে হয় আব্দুর রশীদ ছাহেবের স্ত্রীর সাথে মাদরাসার ব্যাপারে কিছু বলেছে। তোমার আম্মাকে বলিও বাসা ভাড়া ঠিক হয়েছে। খবরটা শুনে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম। আল-হামদুলিল্লাহ! এবার সুন্দর একটা বাসাও আমরা পেয়ে গেলাম। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। পরবর্তীতে তার বাসার আরো একটি ফ্লাট ভাড়া নেওয়া হল।

অতঃপর ছাত্রী সংখ্যা আরো বেড়ে গেলে আমরা পাশে আবু সাঈদ ছাহেবের বাসাও ভাড়া নেই। কিন্তু তার বাসার কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় প্রায় দেড় মাস যাবৎ কোন ভাড়া ও কারেন্ট বিল ছাড়াই প্রায় ৩০ জন ছাত্রী আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের বাসাতেই থাকে। আমাদেরও দুর্ভোগ। নিজেদের বিছানা-কাঁথা সহ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অল্প জায়গার মধ্যে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বর্ণনাতীত কষ্ট স্বীকার করলাম মাদরাসার খাতিরে।

শিক্ষিকা যখন বাবুর্চি :

নতুন বাসা ভাড়া নিয়ে ছাত্রীদের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু একটা অশান্তি লেগে থাকল। রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে তিন তলার ছাদের উপর। কোন কাজের মানুষ নেই। ইতিমধ্যে ছাত্রীও অনেক হয়ে গেছে। আবাসিক শিক্ষিকা মাত্র ২ জন। ছাত্রী প্রায় ১৫/২০ জন। শিরিন ও ফেরদৌসী আপা দু'জন আবাসিকে থাকেন। তারা পালাক্রমে সেই তিন তলার ছাদে উঠে রান্না করে খান এবং ছাত্রীদের খাওয়ান। প্রায় এক বছর যাবৎ এভাবেই চলল। তারপর ভুগরইল

পশ্চিম পাড়া হতে একজন মহিলা নিয়ে আসা হল, কিন্তু তার কাজ মোটেও পরিষ্কার নয়। তাই তাকে বিদায় করা হল। রান্নার কাজ আবার শিক্ষিকাদের উপর পড়ল। ১৯ জন ছাত্রীর রান্না। পুরোদমে বাবুর্চীর কাজ বলা যায়। মহান আল্লাহ শিরীন ও ফেরদৌসী আপাকে উত্তম জাযা দান করুন! পরবর্তীতে রান্নার কাজের জন্য শক্তির মা শাহেরা ভাবীকে আনা হল। তাকে কাজে পেয়ে কিছুটা হলেও হাফ ছাড়লাম।

প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় সফলতা :

২০০৭ সালে আমাদের প্রতিষ্ঠানে কোন ছাত্রী না থাকায় বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন ছাত্রী ছিল না। ২০০৮ সালে জারীন, রুমাইছা ও রুবাইয়া পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। রুবাইয়া থানা পর্যায়ে ১ম স্থান, জারীন ৩য় স্থান ও রুমাইছা ৪র্থ স্থান অধিকার করে। সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি নিলাম। আমীরে জামা'আত ততক্ষণে জেল থেকে জামীনে মুক্তি পেয়েছেন। আগে থেকেই তাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতাম। আমার বড় ছেলে আব্দুল্লাহকে বলতাম, আব্বু! যে যত বেশী লেখা-পড়া করবে সে তত বেশী বড় হবে। তখনও আমীরে জামা'আতকে আমি দেখিনি। শুধু তার নাম শুনেছি। তবুও ছেলেকে বলতাম, আব্বু! ড. গালিব অনেক বড় মানুষ। আপনাকে পড়ে পড়ে তার চেয়ে বড় হতে হবে। সেই শ্রদ্ধার মানুষ যাকে না দেখেই অনেক শ্রদ্ধা করেছি। প্রতিষ্ঠান করার পূর্বে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তার সাথে কিংবা তার পরিবারের সাথে কোনদিন কোন কথা হয়নি। তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠান তুলে দেওয়ার পূর্বে তাকে মাদরাসাটা এক নযর দেখানোরা জন্য কি যে আশা মনের ভিতর কাজ করছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

চোখে যখন বাঁধ ভাঙ্গা অশ্রু :

২০০৯ সালে মারকাযের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কিছু প্রভাব আমার মহিলা মাদরাসার উপরও পড়ে। এলাকার প্রায় ১০০ জন ছাত্রী ঐ সময়ে চলে যায়। আমি অভিভাবকদের সাথে কথা বলতে পারি না। আমার কথা মুখের ভাষায় না হয়ে কথা হয় শুধু চোখের ভাষায়। সেই সময়ে কষ্টের কথা কি দিয়ে বুঝাব? বুঝানোর মত ভাষা আমার নেই। আনন্দ ও বেদনা দু'টিই একসাথে। একদিকে ছাত্রীদের চলে যাওয়ার বেদনা। অন্যদিকে আমীরে জামা'আতকে প্রথমবারের মত ভাঙ্গা মাদরাসায় নিয়ে আসার আনন্দ। তিনি স্বশরীরে মাদরাসায় আসবেন এই আশায় মনটা আনন্দে ভরপুর। শরীফা ভাবী ও খালেদা ভাবী দু'জনকেই বললাম, এবার আমীরে জামা'আতকে আমাদের মাদরাসায় নিয়ে আসতে

হবে। ভাইদের বলেন, তারা যেন এ ব্যবস্থা করে দেয়। উত্তরে তারা দু'জনেই বললেন, হয়তোবা স্যার আসবেন না। তারপরেও আমরা বলে দেখি। পরের দিন জিজ্ঞেস করলাম, বলেছিলেন? তারা দু'জনই উত্তর দিলেন, স্যার আসতে পারবেন না। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, তিনি তো আর বহুদূর থাকেন না। ইনশাআল্লাহ যেভাবেই হোক তিনি আমাদের জন্য একটু হলেও সময় বের করবেন। তাই আমি হাল না ছেড়ে আমীরে জামা'আতের মেয়ে তামান্নার সাথে কথা বললাম। আমীরে জামা'আতের স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে কথা বললাম। তারা দু'জনই বললেন, যাবেন না কেন? ইনশাআল্লাহ যাবেন। তাদের আশ্বাসে আনন্দিত হলাম। জোরদারভাবে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিলাম। কচিকচি বাচ্চাদের মুখে বিভিন্ন দু'আ, কেরাআত, ইসলামী গান, কুরআন তরজমা, হাদীছ তরজামা ও নাটক সবকিছু প্রস্তুত। কিন্তু যেদিন অনুষ্ঠান হবে তার আগের দিন সন্ধ্যার একটু আগে সিরাজ ডাক্তার এসে বললেন যে, আমীরে জামা'আত আসবেন না।

এই সংবাদ শুনে কেঁদে উঠলাম। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বহুবার কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু এত কষ্ট কোনোবার পাইনি। কচি বাচ্চাদের কি দিয়ে বুঝাবো? একটা বাচ্চার সাথে কথা বলতে গেলেও যেন চোখে পানি চলে আসে। বিষয়টা লজ্জাও লাগে। সামালও দিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত মেঘনা ও যমুনার বাধ ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেল। চোখের পানি আর আটকানো গেল না। গড়িয়ে পড়তে লাগল চেপে থাকা বেদনার অশ্রু। এ অশ্রু যেন ভাংগা মাদরাসার অশ্রু।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের অত্র অনুষ্ঠানে না আসার পিছনে কুটচক্রী একটি মহলের হাত ছিল। যা সভ্য সমাজের সামনে পেশ করা সমীচীন নয়। মহান আল্লাহ সকলকেই হেদায়াত করুন-আমীন!!

বর্তমানে যেখানে :

দেখতে দেখতে ২০১০ সাল চলে এল। তিন সদস্যের পুরাতন কমিটির সভাপতি আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ নতুন কমিটির সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর হাতে মাদরাসা হস্তান্তর করলেন। সরলমনা মানুষ। সাদামনেই মাদরাসা তুলে দিলেন আমীরে জামা'আতের হাতে। এবার বিরাট জমিতে মাদরাসা স্থানান্তর হবে। তথা বর্তমানে যেখানে মাদরাসা আছে সে জমিতে। এই জায়গা কখন কিভাবে জমায়েত হয়েছে তা জানি-না। তবে এতটুকু জানি যে, উক্ত জমি শায়খ আব্দুছ ছামাদ ছালাফী ছাহেব ও ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেব দু'জন মিলে কিনেছেন এবং উঁচু প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করেছেন ।

সেখানে মাদরাসা উদ্বোধন উপলক্ষে ছাত্রীদের জন্য আবাসিক ও ক্লাস রুম নির্মাণের প্রয়োজন ছিল। কেননা মাদরাসার প্রাচীর ছাড়া কিছু ছিল না। ২০১০-১১ সালের দিকে আন্দোলনের পক্ষ হতে সেখানে কিছু ক্লাস রুম ও কিছু আবাসিক রুমের কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু কারণবশত আন্দোলন কাজ সম্পূর্ণ না করেই ছেড়ে দেয়। তখন আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব সেখানে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করে অসম্পূর্ণ আবাসিক রুম ও অসম্পূর্ণ ক্লাস রুমের কাজ সম্পন্ন করেন।

এদিকে মাদরাসা চারিদিক থেকে প্রাচীর ঘেরা থাকলেও মাদরাসার পূর্ব পার্শ্বে প্রাচীর ছিল। সেখানে প্রায় দুই-তিন বিঘার মত জমি ছিল। যে জমি সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ছাহেব ও আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব অনেক হাঁটাহাঁটি করে তুহিনের নিকট থেকে ক্রয় করেছিলেন। মাদারাসার মূল গেট সংলগ্ন আরো প্রায় ১ বিঘা জমি ছিল। একদিন হঠাৎ শুনা গেল, সে জমি অন্য একজনের হাতে বায়নামা হয়ে যাচ্ছে। এই খবর জানতে পেরে আমি আব্দুর রাযযাক ছাহেবকে বললাম, যে কোন মূল্যেই হোক না কেন জমি নিতেই হবে। যদি ঐ লোকের পা ধরতে হয় তাও ধরতে হবে, তবুও জমি হাতছাড়া করা যাবে না। তখন আব্দুর রাযযাক ছাহেব সম্পাদক ছাহেবের সাথে কথা বললেন। কথা বলে জানা গেল, এখন 'আন্দোলন'-এর টাকা নেই। আর এত টাকা দিয়ে জমি নেওয়া যাবে না। তখন তো আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়ল। কেননা জমিটা হাতছাড়া হলে মহিলা মাদরাসার মূল সৌন্দর্য্যই থাকবে না। ভবিষ্যতে যে প্রজন্মই মাদরাসা চালাবে তারা অত্যন্ত কষ্ট পাবে এবং মাদরাসাও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতএব সবকিছু চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ঐ সময়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এক জায়গাতে সাড়ে চার লক্ষ টাকা কাঠা দরে তিন কাঠা জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম। মাটির দরদাম সবকিছু হয়ে গেছে। বায়নামার দিন-তারিখও ঠিক হয়েছে। তখন আব্দুর রাযযাক ছাহেবকে বুঝালাম, একটা জাতির প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনিও সেটা সহজ ভাবেই বুঝে নিলেন। নিজের জমি কেনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সম্পাদক ছাহেবের সাথে আবারও কথা বললেন। তারপর নিজের বাড়ীর টাকা দিয়ে মাদরাসার জন্য জমি ক্রয় করা হল। আজ মহিলা মাদরাসার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে কি যে ভাল লাগে। একদম রাস্তার পাশ দিয়ে টানা বাউন্ডারী। সেদিন যদি জমিটা না নেয়া হত, তাহলে হয়তো চিরদিন মহিলা মাদরাসার বাহ্যিক

পরিবেশ বেখাপ্পা থাকত। ফালিল্লাহিল হামদ্। অবশ্য পরবর্তীতে 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

এ কিসের শূন্যতা :

২০১২ সাল। বিরাট প্রাচীর ঘেরা নতুন জায়গাতে মাদরাসা উদ্বোধনের পালা। অনেক জাঁকজমকের সাথে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন হচ্ছে। অনেক জাঁকজমক হলেও আমার মনের মাঝে বিরাজ করছিল মরু প্রান্তরের শূন্যতা।

হয়তো পাঠকরাও আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। উদ্বোধনের দিন 'আন্দোলন'-এর কর্মী থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সকলেই উপস্থিত। কিন্তু একজন মানুষ অনুপস্থিত। যিনি প্রতিষ্ঠানকে তিলে তিলে গড়ে তুললেন, চট-চাটাই, সুঁই-সুতা, কাপড়, ঝাড়ু, পানি, হাড়ি-কুড়ি, কড়াই সবকিছু দিয়ে একটা শিশুর মত করে কোলে করে মানুষ করলেন, অথচ সেই মানুষটি আজ অনুষ্ঠানে নেই। সে মানুষটি আর কেউ নয়। পুরো লেখায় আপনারা বহুবার যার নাম পড়েছেন, এই মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার পুরাতন বা প্রথম কমিটির সভাপতি আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

আমার চোখের সামনে প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন হচ্ছে। সবার চোখে আনন্দের ঝিলিক। কিন্তু সকলের অগোচরে আমার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। আমি বারবার অশ্রু আড়াল করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। অশ্রুকে আর বাধা না দিয়ে আড়ালে গিয়ে তার দরজা খুলে দিলাম। অঝোর ধারায় কাঁদলাম। সহজ সরল একজন মাটির মানুষের সাথে এই ধরণের ধোঁকা, প্রতারণা ও ছলনা আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। কিন্তু তিনি যে কত মাটির মানুষ তা আমি পরে বুঝতে পারলাম। তিনি এটাকে কিছুই মনে করলেন না। বরং আগের মতই নিষ্ঠার সাথে মাদরাসার কাজ করতে থাকলেন। প্রায় ১৯/২০ লক্ষ টাকা খরচ করে মাদরাসার আবাসিক রুম করলেন। যারা তাকে অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেননি তারাও হয়তোবা কল্পনা করতে পারেননি এই মানুষটা এত সহজ-সরল!! আমরা তাকে অপমান করলাম, অথচ সে সেটা বুঝতেও পারেনি। তখন তারা তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বিষয়টি বুঝানোর জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করল। যেমন-

বিদ্যুৎ চলে গেলে ছাত্রীদের পড়ার বিভ্রাট হয়। তাছাড়া ছোট ট্যাংকি নিমিষেই পানি শেষ হয়ে যায়। দু'একদিন পরপর টিউবওয়েলও নষ্ট হয়ে যায়। তাই মাঝে মধ্যে মহিলা মাদরাসা হয়ে উঠে সাহারা মরু প্রান্তর। ছাত্রীরা কোথাও একফোঁটা পান করারও পানি পায় না। ছাত্রীদের কষ্ট দেখে আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবকে ছাত্রীদের জন্য একটি জেনারেটরের ব্যবস্থা করে দিতে

বললাম। আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব ছেলেদের মাদরাসায় জেনারেটরের ব্যবস্থা অনেক আগে করলেও ২০১৩ সালে তিনি মেয়েদের মাদরাসায় জেনারেটরের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানালেন। তখন কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'আপনি মহিলা মাদরাসার কে? 'ভাবখানা মনে হচ্ছে আপনি মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল'।

সুধী পাঠক! এবার আব্দুর রাযযাক ছাহেব বুঝতে পারলেন তিনি মাদরাসা যে কমিটিকে হস্তান্তর করেছেন সে কমিটি আসলে তাকে মূল্যায়ন করে না। এই যে তিনি বিদায় হলেন মাদরাসা থেকে। তার হাতে গড়া মাদরাসায় আর দ্বিতীয় কোনদিন প্রবেশের সুযোগ হয়নি। বাহির থেকে দুঃস্থ-দরিদ্র ছাত্রীদের কষ্টের কথা শুনে শুধু ব্যথিত হন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন না। উল্লেখ্য যে, নওদাপাড়ার ৫ বছরের প্রধান শিক্ষকতার সময় তিনি দুঃস্থ-দরিদ্র ছাত্রদের ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রদের বেতন-ভাতা মওকূফ, বোর্ডিং ফী অর্ধেক করাতে তার কোন জুড়ি ছিল না। ছাত্ররা আবেদন নিয়ে গেলেই হয়। তিনি কোথাও না কোথাও থেকে ব্যবস্থা করে দিতেন। ছাত্রদের বোর্ডিং ফী বাড়ানোর তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই নিয়েই মূলত তার সাথে কমিটির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কমিটি শুধু টাকা চিনে। কিন্তু তিনি যেহেতু নিজে মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। তাই তিনি ছাত্রদের কষ্টটা বুঝতেন। যেদিন তিনি পদত্যাগ পত্র দিয়ে বিদায় নিচ্ছেন, সেদিন মসজিদে ছাত্রদের অঝোর ধারায় কান্না যদি কোন পাষাণ হৃদয়ের মানুষও দেখে, তাহলে বলতে বাধ্য হবে এই সহজ-সরল লোকটা আর কিছু না পারুক ছাত্রদের হৃদয়ের মণি কোঠায় নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। ফালিল্লাহিল হামদ্।

তিনি তার ৫ বছরের প্রধান শিক্ষকতার যুগে কোনদিন ৮টার ১ মিনিট পরে মাদরাসার অফিস রুমে প্রবেশ করেননি। কোনদিন প্রধান শিক্ষকের জন্য বিশেষ চেয়ারে বসেননি। সাধারণ শিক্ষকদের চেয়ারে বসতেন। মাদরাসার ফোন থেকে কোনদিন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এক মিনিট কথা বলেননি। মাদরাসায় এক সন্ধ্যা খেলে নিজের পকেট থেকে তার বিল দিয়ে দিতেন। যার রশিদ মাদরাসার পিয়ন মুযাম্মেল কাটতেন। মাদরাসায় গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করেছেন। জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছেন। অতীতের তিন বছরের শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেছেন। বিদ্যুৎ বিল ও চাউল বিল সহ মাদরাসার নামে যত বিল বাকী ছিল সব পরিশোধ করেছেন। যেদিন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেদিন মাদরাসার বকেয়া ছিল প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। যেদিন দায়িত্ব ছেড়ে দেন, সেদিন মাদরাসার একটাকাও বকেয়া ছিল না। শুধু তাই নয়

যেদিন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেদিন মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫০ জন। আর যেদিন দায়িত্ব ছাড়েন, সেদিন ছিল প্রায় সাড়ে ছয়শ'। মাদরাসার পশ্চিম পার্শ্বের অসম্পূর্ণ তিনতলা বিল্ডিংকে পূর্ণ করে ৪ তলা করেন। পূর্ব পার্শ্বের দু'তলা বিল্ডিংকে তিনতলা করেন। অতি অল্প সময়ে নিষ্ঠার সাথে তার এত খিদমাত হিংসুকদের অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাদের কুটচক্রে তিনি যেমন মহিলা মাদরাসা থেকে আঘাত পেয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হন, তেমনি ছেলেদের মাদরাসা থেকেও তাকে পদত্যাগ পত্র দিতে এক প্রকার বাধ্য করা হয়। তারপর যা হওয়ার তাই হল । যা সভ্য সমাজের কাছে পেশ করা সমীচীন মনে করি না। শুধু মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ করি, তিনি যেন তাদেরকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে হেফাযত করেন। একজন সহজ-সরল মানুষের শত্রুতা করা থেকে হেফাযত করেন। কেননা মহান আল্লাহ কূট-কৌশলীদের চেয়ে অনেক বেশী কৌশল জানেন। সেই সত্তার জালে তারাও একদিন ধরা পড়বেন। দু'আ করি তার আগেই যেন তারা নিজেদের সংশোধন করে নেন-আমীন!!

শিক্ষিকাগণ যখন অফিস সহকারী :

মাদরাসার সূচনালগ্নে আমরা অর্থের অভাবে একজন অফিস সহকারী নিতে পারিনি। তাই শিক্ষিকাগণকে পাঠদানের পাশাপাশি অফিস সহকারীর কাজও করতে হয়েছে। ১ম কিছুদিন খালেদা ভাবী তারপর আমি, তবে আমাকে একটু বেশি করতে হয়েছিল কারণবশত। তারপর শিরিন আপা। শিরিন আপাকেও একটু বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল। কারণ আবাসিকের রান্না, বাচ্চাদের দেখাশুনা, ক্লাস নেয়া এতকিছুর পর আবার অফিস সহকারী কাজটি অনেক কঠিন হয়ে যায়। এরপর ২০১০ সালের শেষের দিকে এসে যুক্ত হলেন বর্তমান অফিস সহকারী মাহমূদা বেগম।

শিক্ষিকাগণের নিরলস অবদান :

এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হতেই শিক্ষিকাগণ আন্তরিকভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেছেন, যার কারণে শিক্ষার্থীরা কোন প্রাইভেট ছাড়াই ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষিকাগণ পাঠদানের পাশাপাশি তারা বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠানের কাজে সহযোগিতা করেছেন। যেমন সাবিহা আপা বর্তমান জুনিয়র সহকারী। তিনি ২০০৫ সালের শুরু হতেই এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। তখন হতে এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। ছাত্রী সংগ্রহ করা, কোন অনুষ্ঠানাদিতে গ্রামের মহিলাদের দাওয়াত দেওয়া, গ্রাম হতে দু'পাঁচ কেজি ধান-চাল যখন যা পেয়েছেন তা সংগ্রহ করে মাদরাসায় দিয়েছেন। আমরা তার

অবদান কখনও ভুলতে পারব না। আল্লাহ তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। তাছাড়া আমাদের শিক্ষিকাগণ বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। যেমন প্রতি বছর বার্ষিক ইজতেমায় শিক্ষিকাগণ অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে ইজতেমার মহিলা প্যান্ডেলে সহযোগিতা করেছেন। সবার অবদানের কথা ভুলতে পারব না। আল্লাহ তাদের সবাইকে এত কিছুর বিনিময়ে যেন পরকালীন জান্নাত নসীব করেন-আমীন! আল্লাহুম্মা আমীন!!

শরীফা ও খালেদা ভাবীর অবদান :

শরীফা ও খালেদা ভাবীর অবদান ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তারা দু'জন আমার পাশে না থাকলে প্রতিষ্ঠানের কাজ চালু করাই কঠিন ছিল। খালেদা ভাবীর কথা বিশেষ করে বলতেই হয়, তিনি আমার পাশে না থাকলে প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখা দুরহ ব্যাপার ছিল। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত নসীব করুন- আমীন!!

জনাব শামসুল মাস্টার ছাহেবের অবদান :

মাদরাসার সূচনা হতে শামসুল মাস্টার ছাহেবের অবদান অপরিসীম। মাদরাসার প্রথম দিন হতে যাবতীয় খরচাদী তার হাত দিয়ে করানো হয়। পরে তার ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্নভাবে করিয়ে নেওয়া হয়েছে। শামসুল মাস্টার ছাহেব মাদরাসার সকল কাজের মাঠকর্মী ছিলেন বলা যায়। এছাড়া বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত নসীব করুন-আল্লাহুম্মা আমীন!!

'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের অবদান :

সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনেক অবদান রয়েছে। মাদরাসার সূচনায় ক্লাস তার বাসাতেই শুরু করার সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি। যদিও কারনবশত তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন সময় তিনি অনেক সুপরামর্শ দিয়েছেন। ২০০৬ সালের অনুষ্ঠানে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া সহ বিভিন্ন সময় তার সাধ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেছেন। যখনই কোন বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতেন। সেই সাথে জমি-জায়গার কাজগুলোতে তিনি আব্দুর রাযযাক ছাহেবের সাথে থেকে তাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত নসীব করুন-আল্লাহুম্মা আমীন!!

আমীরে জামা'আতের স্ত্রীর অবদান :

সবার অবদানের মধ্যে আমীরে জামা'আতের স্ত্রীর অবদানও কম নয়। যদিও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তার সাথে কোন আলাপ আলোচনা হয়নি। প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর হতে তার সাথে সবসময় যেকোন বিষয়ে সমস্যা হলেই আলোচনা করতাম, পরামর্শ নিতাম। তিনি আমাকে বিভিন্ন সময় অনেক সুপরামর্শ দিয়েছেন। আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। ভালবেসেছেন। ২০০৭ সালের দিকে যখন মাদরাসাকে কেউ তেমন চিনত না সেই সময়ে তিনি মহিলাদের বৈঠকী দানের টাকা জমা করে মহিলা মাদরাসার জন্য আমার হতে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। সেদিনের ঐ টাকা কত মূল্যবান মনে হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশের নয়। তিনি মহিলা মাদরাসার অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত নসীব করুন-আল্লাহুম্মা আমীন!!

মুকাররম বিন মুহসিনের অবদান :

মুযাফফরের ছোট ভাই মুকাররম। সে মারকাযের একজন মেধাবী ছাত্র। বর্তমানে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরবে লেখাপড়া করছে। মাদরাসার প্রাথমিক পর্যায়ে সে অনেক সহযোগিতা করেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশ্ন কম্পোজ করে দিয়েছে। পরীক্ষার খাতা, বই-পুস্তক ইত্যাদি কিনে দিয়েছে। যে কোন প্রয়োজন হলেই বাচ্চাদের বলতাম, যাও মুকাররম ভাইকে বল, আম্মা একাজ করে দিতে বলেছে। সাথে সাথে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই কাজ করে দিয়েছে। তার জন্যও আল্লাহ্র নিকট আকুলভাবে দু'আ করি, আল্লাহ যেন তাকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ দান করে-আমীন!!

গ্রামবাসীর অবদান :

গ্রামবাসীর অবদান সর্বাগ্রে। কেননা শিক্ষার্থী ছাড়া প্রতিষ্ঠানের কল্পনাই বাতিল। তারা আমাদের জীর্ণশীর্ণ প্রতিষ্ঠানে বাচ্চাদের ভর্তি করে অনেক সহযোগিতা করেছেন। তাছাড়া তারাও বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। একদিন আব্দুর রাযযাক ছাহেব ভুগরইল পশ্চিম পাড়ায় বাঁশ কিনতে গেলেন মাদরাসার কাজের জন্য। একজন হিতাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি তাকে বলেন, ভাই! আপনারা এই মাদরাসার জন্য এত কিছু করছেন, আমরা তো কিছুই করতে পারছি না। আমার বাঁশ বাগান আছে। মাদরাসার কাজের জন্য যত প্রয়োজন নিয়ে যান, কোন টাকা লাগবে না। তাছাড়া হাফীযুদ্দীন ছাহেবের মসজিদের

জন্য দান করা জমিটুকু না থাকলে কি যে হত সেটা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ তুমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও! সকলকে জান্নাতবাসী করে দাও! আরো যে কত কে সহযোগিতা করেছে তাদের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। প্রতিপালক তোমার এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে যে যেভাবে সহযোগিতা করেছে তুমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও! তাদের গুনাহ মিটিয়ে দাও! বিনা হিসাবে জান্নাত নসীব কর-আল্লাহুম্মা আমীন!!

স্মৃতিচারণ

(১) মহিলা মাদরাসার প্রথম ছাত্রী জারীন তাসনীমের স্মৃতিচারণ :

আমি রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্র উত্তর নওদাপাড়ায় অবস্থিত 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স'-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান **'মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা'**য় অধ্যায়নরতা। কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে বহুমুখী আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত মানসম্মত পড়ালেখা, সেই সাথে এখানকার ছাত্রীদের আকর্ষণীয় ফলাফলের কারণে আজ অত্র প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশের আনাচে কানাচে। কিন্তু এ সুনাম এ সাফল্য কি একদিনেই এসেছে? সত্যি বলতে কি, বহু কষ্টের সাগর পাড়ি দিয়ে এক প্রকার ইতিহাস গড়েই প্রতিষ্ঠান এ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আমার একটু একটু স্মরণ আছে, আমি তখন অনেক ছোট। আমাদের বাসার পাশেই থাকতেন শ্রদ্ধেয় আলেম আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এবং তার স্ত্রী। আমি হয়তো কোনদিন কল্পনাও করিনি তার বাড়ীই হবে আমার প্রথম মাদরাসা এবং তার স্ত্রীর মত মহতী নারীই হবেন আমার প্রথম শিক্ষিকা। আজ ভাবলে অনেক ভাল লাগে, আল্লাহ না চাইতেই আমার প্রতি অনেক দয়া করেছেন। দিনটির কথা আমার সঠিক স্মরণ নেই। ২০০৪ সালের কোন এক সকালে আমার আম্মু আমাকে আব্দুর রাযযাক উস্তাদযীর বাসায় পড়তে পাঠালেন। আমি তাঁর বাাসায় গেলাম। আমার শ্রদ্ধেয় আপা বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা তার রুমে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় বসে আমাকে পড়ানো শুরু করলেন। এই যে আমার শিক্ষা জীবনের যাত্রা শুরু হল, আস্তে আস্তে আপার কাছেই আরবী ভাষার গ্রামারের প্রায় সকল বই সহ হাদীছের গ্রন্থ বুলূগুল মারাম, মিশকাত এবং এখন সুনানে তিরমিযী পড়ছি। ফালিল্লাহিল হামদ্।

তখন তো আর বুঝিনি; আজ বুঝি, সেদিনটি কত ঐতিহাসিক ছিল। সেদিন যেমন ছিল আমার প্রথম দিন, তেমনি ছিল 'মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা'র প্রথম দিন। একজন ছাত্রী ও একজন শিক্ষিকা দিয়ে সেদিন মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা তার যাত্রা শুরু করেছিল। আজ সে মাদরাসা শত সফলতার কৃতিত্ব

মাথায় নিয়ে শত ফুলের বাগান হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ফালিল্লাহিল হামদ্।

আমি আমার প্রতি শ্রদ্ধেয় আপার অবদান কোনদিন ভুলতে পারব না। তার হাতে আমার শিক্ষা জীবনের শুধু হাতেখড়ি নয় বরং আমি আজ যতটুকু ইলম হাসিল করেছি এবং করছি তার পিছনে আপার অবদানকে আমার কলম ভাষার জামা পরাতে অক্ষম। শুধু মহান আল্লাহ্র নিকট দু'হাত তুলে বলতে চাই, হে আল্লাহ! তুমি বড় আপা সহ সকল আপাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান কর! দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদাশীলদের অর্ন্তভুক্ত কর-আল্লাহুম্মা আমীন!!

(জারীন তাসনীম)
ছানুবিয়া দ্বিতীয় বর্ষ (২০১৬)
মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা
নওদাপাড়া রাজশাহী।

(২) আবাসিকের প্রথম ছাত্রী আমেনার স্মৃতিচারণ :

০৭/০১/২০০৮ রোজ বৃহস্পতিবার, আমি আমার পরিবার ছেড়ে দিনাজপুর থেকে আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের 'মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা'য় ভর্তি হতে আসি। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৮/৯ বছর। আবাসিক ছাত্রী হিসাবে সর্বপ্রথম আমিই ভর্তি হই। তখন পর্যন্ত অন্য কোন ছাত্রী ভর্তি না হওয়ায় আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয় আব্দুর রাযযাক উস্তাদযীর বাড়ীতে। আমি পরিবার ছেড়ে চলে আসলেও আমার মনে হয়নি আমি চলে এসেছি, বরং আমার মন বলছিল এটা আমার আরেক পরিবার। আমি এক মাকে হারিয়ে আব্দুর রাযযাক উস্তাদযীর স্ত্রী আমার রাযিয়া আপাকে 'মা' হিসাবে পেয়েছিলাম। তার আদর ও স্নেহ আমাকে মায়ের অভাব ভুলিয়ে দেয়। তাঁর মায়া-মমতা, ভালবাসা ও আর্দশ নিয়ে চলতে থাকে আমার শিক্ষা জীবন। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম। এখন আমি সে মাদরাসা থেকে দাখিল পরিক্ষার্থী।

আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই, আমার প্রতি তাঁর সীমাহীন মমতা ও ভালবাসা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আমি আমার শ্রদ্ধেয় আপার প্রতি চির কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ্র কাছে আমার একটাই দু'আ তিনি যেন আমার আপাকে চিরদিন এভাবে কুরআন ও হাদীছের ছাত্রীদের ভালবাসার তাওফীক্ব দান

করেন। তার চেহারাকে যেন আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেন। আমাদের প্রতি তার ছায়াকে যেন আরো দীর্ঘায়িত করুন-আমীন!!

(আমেনা)
দাখিল পরিক্ষার্থী (২০১৬)
মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী

(৩) মহিলা মাদরাসার স্থানীয় শিক্ষিকা সাবিহা আপার স্মৃতিচারণ :

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।

আস-সালামু আলাইকুম! আমি নওদাপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দা। বহুদিন থেকে বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু ছোট থেকেই ধর্মীয় মানসিকতা নিয়ে বড় হওয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু করার অনেক সখ ছিল। আল-হামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ আমাকে সে সুযোগ দিয়েছেন। আজ আমি 'মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার' একজন শিক্ষিকা।

আমাদের প্রতিষ্ঠানটি ২০০৪ সালে রাজশাহী যেলার অন্তর্গত উত্তর নওদাপাড়ায় চালু হয়। তিন সদস্য বিশিষ্ট অত্র প্রতিষ্ঠানের একটি পরিচালনা কমিটি ছিল। যার সভাপতি আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এবং সদস্য হিসাবে ছিলেন ড. সাখাওয়াত হোসাইন ও শামসুল আলম মাস্টার। ২০০৫ সালে পহেলা জানুয়ারীতে প্রধান শিক্ষিকা রাযিয়া আপার আহ্বানে সহকারী শিক্ষিকা হিসাবে আমি যোগদান করি। তখন অত্র মাদরাসার শিক্ষিকা ছিলেন ৩ (তিন) জন। ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র ১০/১২ জন। প্রতিষ্ঠানে এসেই আমি যে স্কুলে চাকরী করতাম সে স্কুল সহ আরো বিভিন্ন স্কুল থেকে এলাকার অনেক ছেলে-মেয়েকে ১০%হারে বেতন ধার্য্য করে অত্র মাদরাসায় ভর্তি করালাম।

আমি যখন আসি, তখন ক্লাস হত মসজিদ ঘরে। পরবর্তীতে মসজিদ ঘরের আশেপাশে আরো কয়েকটি ঘর তৈরি করা হল। উপরে টিন, চাটাইয়ের বেড়া ও মেঝেতে পাটি এই ভাবে কয়েক বছর কেটে যায় আমাদের। তখন শিক্ষিকাদের ভাতা ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। তাও প্রতিমাসে নয় বরং বছরে ২/৩ বার দেওয়া হত। দিন যায় বছর যায় ছাত্রী বাড়ে, ক্লাস বাড়ে, শিক্ষিকা বাড়ে, আমদের বেতনও বাড়তে থাকে ক্রমান্বয়ে।

সভাপতি ছাহেব নতুন কেনা নিজের জায়গায় প্রাচীর ঘিরে ক্লাসরুম বৃদ্ধি করেন। একসময়ে বাহিরের ছাত্রী ও অভিভাবকের চাপে আবাসিক চালু করেন। আবাসিক শিক্ষিকা ফেরদাউসী আপা ও শিরিন আপা পালাক্রমে রান্না ও পাশাপাশি মেয়েদের দেখাশুনার কাজ করেন। অতঃপর প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সাল থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত মারকাযের অধীনে মহিলা শাখা হিসাবে হস্তান্তর হল। মাদরাসা হস্তান্তর হলেও ২০১৩ সাল পর্যন্ত একই নীতিতে চলতে থাকে। হঠাৎ ২০১৪ সালে প্রশাসনিক নীতিমালার পরিবর্তন দেখা যায়। কিছু শিক্ষিকার পদোন্নতি ও অবনতি নিয়ে বৈষম্য শুরু হয়। ফলতঃ প্রতিষ্ঠান চলতে থাকলেও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।

আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে অত্র প্রতিষ্ঠানের উত্তোরত্তর উন্নতি এবং সকল ষড়যন্ত্র থেকে পরিত্রাণ কামনা করছি।

(সাবিহা)
সহকারী শিক্ষিকা, মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(৪) হিফয শিক্ষিকা সুফিয়া আপার স্মৃতিচারণ :

আমি সুফিয়া। আমার হাজবেন্ড মাওলানা মাক্বূলের সাথে অনেক আগে থেকেই আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে তিনি আমাদেরকে তার প্রতিষ্ঠান নওদাপাড়া 'মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা'য় নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে তিনি আমার হাজবেন্ডকেও ছেলেদের মাদরাসায় নিয়ে আসেন। ইতিপূর্বে আমি যে প্রতিষ্ঠানে ছিলাম সেখানে শুধু হেফয পড়াতাম এবং মাদরাসাতেই ছাত্রীদের সাথে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখানে এসে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। থাকা আলাদা জায়গায় এবং ছাত্রীদের পড়ানো বিষয়টি আলাদা ক্লাসরুমে। যেটা আমার কাছে একদম নতুন। প্রাথমিক অবস্থায় কোন আবাসিক না থাকায় আমাদের থাকার বিষয়টি আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব তার বাসায় করেন। বেশ কিছু দিন আমরা তার বাসাতেই খাই। ঐ সময় আমার পরে আরেকজন শিক্ষিকা আসেন। তারও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আব্দুর রাযযাক ছাহেব তার বাসাতেই করেন। প্রায় বেশ কিছুদিন পরে আমরা নিজেরা আলাদা আলাদা রান্না করে খাওয়া শুরু করি। আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের পরিবারের শুকরিয়া আদায় করার মত আমাদের কোন ভাষা

নেই। প্রায় এক বছর কোনরূপ বাসা ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াই আমরা তার বাসাতে থাকি। সে সময় মাদরাসার ছিল করুণ অবস্থা। আমাদের বেতন ছিল মাত্র দেড় হাযার টাকা। আব্দুর রাযযাক ছাহেবই কোনভাবে কষ্ট করে সামান্য এ পয়সাটুকুর ব্যবস্থা করতেন। তারপর আবাসিক ব্যবস্থা চালু হলে আমরা আবাসিকে চলে যাই। সেদিনের প্রতিষ্ঠান আর আজকের প্রতিষ্ঠান যেন আকাশ যমীন তফাৎ। সেদিন ছিল জীর্ণ শীর্ণকুটির। আর আজ বিশাল জমিতে প্রাচীর ঘেরা উন্নত বিল্ডিং।

২০০৮ সালের মাঝামাঝিতে আমাদের পারিবারিক সমস্যার কারণে আমি চলে যাই। আবার ২০১২ সালে এসে কাজে যোগদান করি। মহান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি, তিনি যেন এই প্রতিষ্ঠানকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখেন এবং এখান থেকে দেশের মেয়েদের দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করে আদর্শ নারী হিসাবে গড়ে উঠার তাওফীক্ব দান করেন-আল্লাহুম্মা আমিন!!

(সুফিয়া)
হাফেযী শিক্ষিকা, মহিলা সালাফিয়া
মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(৫) আবাসিক শিক্ষিকা ফেরদাউসী আপার স্মৃতিচারণ :

প্রথমে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, আল-হামদুলিল্লাহ। আমি ২০০৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী 'মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা'য় শিক্ষিকা হিসাবে যোগদান করি। মাদরাসার প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন রাযিয়া আপা। যোগদানের দৃষ্টিকোন থেকে মাদরাসার অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, এত জরাজীর্ণ শ্রেণী কক্ষে ছাত্রী ও শিক্ষিকাগণ কিভাবে নিজেরদেরকে মানিয়ে নিয়ে ক্লাস করছে!! তখনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করেছিলাম, হে আল্লাহ! তুমি এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল কর! ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রেখ-আমীন!!

পর্যায়ক্রমে মাদরাসার ইতিহাস জানতে পারি। জানতে পারি প্রধান শিক্ষিকা রাযিয়া আপার নিরলস প্রচেষ্টার কথা।

যাইহোক আমি মাদরাসার আবাসিকে থাকা শুরু করলাম। মাত্র তিনজন ছাত্রী দিয়ে আবাসিক শুরু হল। শিক্ষিকা ছিলেন তিনজন তার মধ্যে আমিও ছিলাম। প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে আলাদা কোন বাবুর্চির বদলে আমরা শিক্ষিকাগণ নিজে হাতে রান্না করে ছাত্রীদের খাওয়াতে লাগলাম। টিনের

চালের নীচে গরমের দিনে রান্না করা যে কত কষ্টের তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। টিনের চালের তলা থেকে যখন আমরা দু'তলা ভবনে আসলাম তখন দু'তলার উপরে উঠে ছাদে রান্না করতে হত। টিনের চালের গরম না থাকলেও ছাদে রান্না করার কষ্ট ছিল সীমাহীন। সত্যি ছাত্রী-শিক্ষিকা সকলের কষ্টের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান আজ বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই চাটাইয়ের ঘর থেকে দালান হয়েছে। দুইজন ছাত্রী থেকে শতশত ছাত্রী হয়েছে। শিক্ষিকাদের আর আগের মত রান্নার জন্য কষ্ট করতে হয় না। সবই মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা।

পরিশেষে কামনা করি, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদের সকলের কষ্টের বিনিময়ে পরকালে জান্নাত দান করেন এবং সঠিক দ্বীনী শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখেন-আমিন! ছুম্মা আমিন!!

(ফেরদাউসী)
সাবেক শিক্ষিকা, মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২০০৬ ইং সালের বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রধান শিক্ষিকার লিখিত বক্তব্য

বিশ্ব পালনকর্তার গুণকীর্তণের পর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর এবং আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দাগণের উপর।

শত সহস্র শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানাই মাননীয় ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামা'আত প্রধান অতিথি ড. মুছলেহুদ্দীন ছাহেব সহ উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর প্রতি। আজকের এই অনুষ্ঠানটি এক বিরাট সাফল্য ও আনন্দের সংবাদ বহণ করে, যা ইতিপূর্বে ছাত্রীদের বক্তব্য ও সংলাপের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন।

আমাদের দেশের মহিলা সমাজ দ্বীনী শিক্ষা হতে অনেক পিছনে। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে তারা যেমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তেমনি তাদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে নানা কুসংস্কার। কেননা শিক্ষাবিহীন জাতি অন্ধ। আল্লাহ্‌র বাণী, 'হে নবী আপনি বলুন! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান'? *(আন'আম ৬/৫০)*। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা শিক্ষিতকে চক্ষুষ্মানের সাথে এবং অশিক্ষিতকে অন্ধের সাথে তুলনা করেছেন। তাই যে জাতি ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অজ্ঞ সে জাতি

বাস্তবেই অন্ধ বৈ-কি। তাছাড়া শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচতে পারে না, শিক্ষা ছাড়া জাতিও তেমন চলতে পারে না।

ইসলামে নারীর গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূল (ছাঃ) কাজের মেয়েকেও উত্তম শিক্ষা দিতে বলেছেন। নারী জাতির শিক্ষার ব্যাপারে জনৈক মনীষী বলেন, মা হচ্ছে সন্তানদের জন্য প্রথম শিক্ষালয়'। একজন সুশিক্ষিত মা গড়ে তুলতে হলে তার যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নারীর জন্য সুশিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া সুশিক্ষিতা মা আশা করা যায় না। বিশ্ব বিখ্যাত বীর Nepolian বলেন, Give me an educated mother and I will give you an educated nation. অর্থাৎ 'তুমি যদি আমাকে আদর্শ মা দাও, তাহলে আমি তোমাকে আদর্শ জাতি দেব'।

সমাজ, জাতি ও দেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মূল উৎস হচ্ছে নারী। এই জন্য আমি মনে করি দেশের আনাচে-কানাচে সুপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ধর্মপ্রাণ ভাই-বোন সকলের আদাজল খেয়ে লাগা উচিৎ। তাছাড়া 'দেশ গড়'! 'জাতি গড়'! এই শ্লোগান জোরে শোরে বলে কোন লাভ নেই।

অত্র এলাকায় আসার পর থেকে কিভাবে একটি দ্বীনী প্রদীপ জ্বালিয়ে এলাকার মহিলা সমাজকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় এ নিয়ে কল্পনা-জল্পনা করতে করতে একদিন এলাকার মহিলাদের ডেকে বিষয়টি তাদের সামনে উপস্থাপন করি। তারা আমাদের সাথে একমত হন এবং আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই হিসাবে ২০০৪ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী হতে মাত্র ১০/১২জন ছাত্রী ও তিনজন শিক্ষিকা নিয়ে অত্র প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি চালু করে আমরা যে কি বিপদের মধ্যে পড়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। কারণ এর কোন জায়গা নেই, ঘর দরজা কিছুই নেই। নেই ছাত্রীদের বসার জায়গা। এলাকার লোকজনেরও সুনযর নেই। আমরা যাদের উপর ভরসা করে কাজে হাত দিলাম তারাও মিথ্যা অভিযোগে জেল হাজতে বন্দি হয়ে গেলেন। ফলতঃ তাদের পক্ষ থেকেও কোন সহযোগিতা আমরা পাইনি।

প্রথমে মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের বাসায় ক্লাস চালু করা হয়। পরে ছাত্রী সংখ্যা বেশি হলে মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের বাসায় ক্লাস চলে। তারপর আমাদের সকলের সুপরিচিত ডাক্তার হাফীযুদ্দীন ছাহেব কর্তৃক মসজিদের জন্য দান করা সামান্য একটু জমিতে চাটাই দিয়ে ঘিরে অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালানো হয়। সেখানে চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড রোদে অসহনীয় গরমের সময় এই

টিনের নিচে অতিকষ্টে অবস্থান করে ক্লাস নিতে হয়। যেখানে প্রতিষ্ঠানের বসার বেঞ্চ নেই, সেখানে গরমের সময় হালকা ফ্যানের বাতাসের আশা করা ছিল আকাশ কুসুম কল্পনা। আর ফ্যান লাগাবই বা কিভাবে, মাদরাসার তো কোন গেট নেই। আজ লাগালে কাল চুরি হয়ে যাবে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে পা ফেলতে ইচ্ছা হয় না। ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে মাদুর পেতে আমরা ছাত্রীদের ক্লাস করিয়েছি। কি যে কষ্ট হয়েছে ছাত্রীদের ও শিক্ষিকাদের সে অপরিসীম কষ্টের কথা লিখে প্রকাশ করার নয়। উপরন্ত 'পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটা'ও সহ্য করতে হয়েছে। যাক ওসব কথা বলে আপনাদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করতে চাই না। আমি আমার মূল কথার দিকে ফিরে আসছি। এত ঝড়-তুফান মাথায় করেও আমরা আমাদের কাজ করতে একটুও কুণ্ঠিত হইনি, বরং দৃঢ় মনোবল নিয়ে আমাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে যাচ্ছি। জীর্ণশীর্ণ ভাঙ্গা কুটিরে সত্যই যে আমার ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পেরেছি, মহান আল্লাহ্‌র অশেষ করুনায় তা আজ প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জীর্ণ কুটিরের ছাত্রীরা বৃত্তি পরীক্ষায় যে সফলতা দেখিয়েছে তা সত্যি হৃদয় জুড়ানো, চক্ষু শীতলকারী। আমাদের অশেষ কষ্টের ফলাফল মহান আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করলেন। পরকালে এর চেয়ে অধিক বিনিময় আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন বলে আমরা আশাবাদী। এই আশায় সীমাহীন কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার তাওফীক্ব দান কর এবং সেই সঙ্গে এলাকাবাসীকে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করার তাওফীক্ব দাও-আল্লাহুম্মা আমীন!!

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল মহিলা পুরুষের দৃষ্টি আর্কষণ করে বলছি যে, আপনাদের অমূল্য সম্পদ এ মাদরাসাটি বর্তমানে অত্যন্ত অর্থাভাবে ভুগছে। ছাত্রীদের আরো উন্নত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাহির থেকে দু'জন অভিজ্ঞ শিক্ষিকা আনা হয়েছে। তাদের জন্য প্রতি মাসে প্রায় ৩০০০ টাকা খরচ হয়। আর আমরা ছাত্রীদের নিকট হতে যে সামান্য পয়সা ফী হিসাবে গ্রহণ করে থাকি তা থেকে মাদসার আনুষঙ্গিক খরচের পর উদ্বৃত্ত সামান্য টাকা দিয়ে প্রতি বছর চাটাইয়ের বেড়া দিতে হয়। এছাড়া অতিকষ্টে ছাত্রীদের বসার জন্য কিছু বেঞ্চের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তবুও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীরা এখনো বাহিরে বারান্দায় মাদুর পেতে ক্লাস করছে। বর্তমানে মাদরাসাটির বিভিন্ন ক্লাসরুমের বেড়াগুলো মেরামতের অভাবে একেবারেই জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই আপনাদের নিকট বিশেষ ভাবে জানাচ্ছি যে, বর্তমানে ১টি অফিস রুম, ১টি

আলমারি, কয়েক সেট বেঞ্চ, একটি বাথরুম এবং ছাত্রীদের খাবার পানির ব্যবস্থা করা খুব যরূরী। এজন্য আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। আপনাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে যা পারেন মুক্ত হস্তে দান করুন! এই দান আপনাদের নষ্ট হবে না, বৃথা যাবে না ইনশাআল্লাহ। দান আল্লাহ্‌র ইবাদত সমূহের মধ্যে অন্যতম ইবাদত, যা সকল মুসলিমের তথা ধনী-গরীব সবার জন্য যরূরী। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'তোমরা তোমাদের মৃত্যু আসার পূর্বে তোমাদের রিযিক্ব হতে দান কর'! অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দান করতে বলেছেন, যার যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ রয়েছে তা থেকেই দান করতে বলেছেন। মৃত্যু আসার পূর্বে দান করতে বলেছেন। কেননা মৃত্যু আসার পর আপনার সম্পদ আপনার নয় ।

হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দা বলে, 'আমার মাল' 'আমার সম্পদ'। অথচ তার সম্পদ তিন ভাগে বিভক্ত। যা খায়, তা শেষ করে। যা পরিধান করে, তা ছিড়ে ফেলে। আর যা দান করে, তা পরকালের জন্য সঞ্চায় করে। এছাড়া যা সে জমা করে, তা মানুষের জন্য ছেড়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে সেটাই তার সম্পদ, যা সে দান করে। তা পরকালের জন্য জমা থেকে যায় এবং সেটা পরকালে তার উপকারে আসবে। যেদিন কেউ কারো উপকার করতে পারবে না।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দান করা উচিত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি দান করার কিছু না পায়? তখন সে যেন আপন হাতে কাজ করে, সে উহা দ্বারা নিজেও উপকৃত হবে এবং অন্যকেও দান করবে। তারা আবার বললেন, যদি সে এই ক্ষমতাও না রাখে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে নিপিড়িত অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করবে। তারা আবারও জিজ্ঞেস করলেন, যদি এরূপও করতে না পারে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে যেন ভাল কাজের উপদেশ দেয়। তারা আবারও জিজ্ঞেস করলেন, যদি সে ইহাও না করতে পারে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহলে অন্তত সে যেন মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে। ইহাই তার জন্য দান' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, দান করতেই হবে। কেননা দান আল্লাহ্‌র ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়, কবরের আযাবকে মিটিয়ে দেয়। যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া

ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন মুমিন বান্দা তার দানের ছায়ার নিচে থাকবে। দান করলে মানুষ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পায়। তাই আপনারা ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে যে যতটুকু পারেন দান করবেন।

আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত না পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমরা সবাই যেন তার জন্য আন্তরিকভাবে দু'আ করি যে, আল্লাহ যেন তাকে মুক্তি দিয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠানে গুলোতে উপস্থিত থাকার তাওফীক্ব দান করেন-আল্লাহুম্মা আমীন!!

হে আল্লাহ! তুমি তাকে মুক্তি দিয়ে দীর্ঘায়ু দান করে মুসলিম জাতিকে কল্যাণ সাধন করার তাওফীক্ব দান কর-আল্লাহুম্মা আমীন!!

পরিশেষে দু'আ করি মহান আল্লাহ যেন প্রতিবছর আমাদের এরকম একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার তাওফীক্ব দান করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করার তাওফীক্ব দান করেন। হে আল্লাহ! তুমি রহমানুর রহীম! আমাদের সকল দু'আ কবুল কর-আল্লাহুম্মা আামীন!!

আসসালামু আলাইকুম

মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার সাফল্য :

২০০৬ সালে বৃত্তি পরিক্ষায় দু'জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে থানা পর্যায়ে দু'জনই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

২০০৭ সালে ঐ শ্রেনীতে কোন ছাত্রী ছিল না।

২০০৮ সালের বৃত্তি পরিক্ষায় ট্যালেন্টপুলে প্রথম স্থান সহ তিনজন বৃত্তি পায়।

২০০৯ সালে মাত্র একজন অংশগ্রহন করে। সেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে মাদরাসার মুখ উজ্জ্বল করে।

২০১০ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মেধা তালিকায় ৮ম স্থান অধিকার সহ শতভাগ সাফল্য নিয়ে আসে কোমলমতি ছাত্রীরা।

২০১১ সালের প্রাথমিক সমাপনী ও জেডিসি ৮ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় ২জন জিপিএ 5 সহ শতভাগ সাফল্য অর্জন করে।

২০১২ সালে সারা বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে ৫ম স্থান অধিকার করে ।

২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ প্রত্যেক বছরেই প্রায় ১০/১২জন ছাত্রী জি. পি. এ. 5 সহ শতভাগ সাফল্য।

প্রধান শিক্ষিকা যেভাবে :

প্রথম যখন আমরা মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করি, তখন কোন লিখিত কমিটি ছিল না। তাই শিক্ষিকা আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দেয়া হয়নি। আমি, শরীফা ভাবী ও খালেদা ভাবী মিলে মাদরাসা শুরু করি। আমরাই শিক্ষিকা। আমরাই সব। ২০০৪ সাল ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে **'মহিলা সালাফিয়াহ মাদরাসা'**র যাত্রা শুরু হয়। প্রথমদিন হাজিরা খাতায় নাম স্বাক্ষর করা হবে। আমি শরীফা ভাবীকে বললাম, ভাবী আপনি দায়িত্বশীল হিসাবে স্বাক্ষর করেন। খালেদা ভাবীও উপস্থিত আছেন। শরীফা ভাবী বললেন, তা কি করে হয়? আপনি বড় আর আমি ছোট। আপনি কামিল পাশ আর আমি সবেমাত্র আলিম পাশ। তাছাড়া আপনি একজন পুরাতন দায়িত্বশীল শিক্ষিকা। আপনার অভিজ্ঞতা আছে। আর আমি কিছুই না। তখন তারা দু'জনই বললেন, এ কাজের হক্বদার আপনি। আপনিই দায়িত্বশীল হিসাবে স্বাক্ষর করেন। এইভাবে শুরু হল আমার প্রধান শিক্ষকতা। আল-হামদুলিল্লাহ আমাকে কোন কমিটি নিয়োগ দেয়নি। নিজে থেকেও চেয়ে নেইনি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এসেছিল দায়িত্ব।

অশ্রু :

এই দ্বীনী কাজের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে কতদিন যে কারণে-অকারণে অশ্রু ঝরেছে তার ইয়ত্তা নেই। শিক্ষাও হয়েছে অনেক। ভাল কাজে বাধা, লাঞ্ছনা, ধিক্কার অনেক বেশি তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। যারা এর চেয়ে বড় বড় কাজ করছেন তাদের কষ্ট যে আরো কত বেশি, সেটা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। ২০০৬ সালের প্রথম দিকে একবার অশ্রু ঝরে। শত অনুরোধ করে শরীফা ভাবীকে রাখতে না পারায়। কিছু বলতে না পেরে শুধু অশ্রুর মাধ্যমে বিদায় দিয়েছি শরীফা ভাবীকে। ভেবে পাচ্ছিলাম না এখন কেমন করে প্রতিষ্ঠান চালবো? কি হবে এখন? সাবিহা আপা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি অত চিন্তা করছেন কেন? আমি আপনাকে কালকেই শিক্ষিকা জোগার করে দিচ্ছি। তিনি কথা রাখলেন। ভুগরইলের রাযিয়া নামে একটা মেয়েকে এনে দিলেন সবেমাত্র দাখিল পাস করেছে। বেশিদিন থাকেনি সে।

২০০৯ সালে মারকাযের কোন্দলে ছাত্রীরা শুধু চলে যেতে লাগল। তখন ছাত্রীদের শুধু অশ্রুর মাধ্যমে বিদায় দিয়েছি। ২০১০ সালে জুলাই মাসের দিকে শরীফা ভাবীর একটি কথার কারণে একটানা অশ্রু ঝরল প্রায় ১৫ দিন। ২০০৭ সালের দিকে ভাঙ্গা চাটাইয়ের বেড়াকে সামান্য ইটের মাধ্যমে ঘিরতে গিয়ে

অশ্রু ঝরল প্রবল ধারায়। ২০১২ সালে মাদরাসা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অশ্রু ঝরল অঝোর ধারায়। যার তিলেতিলে ঘাম ঝরানো পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে মাদরাসা তিনিই ছিলেন না সেদিন। ২০১৩ সালে 'আপনি মাদরাসার কে? ভাবখানা মনে হচ্ছে আপনিই প্রিন্সিপ্যাল' কথাটি শুনে ঝরল অশ্রু বহুদিন। ২০১৬ সালের দোসরা জানুয়ারীতে আবারো ঝরল অশ্রু। বড় মানুষের মুখে নিজের নামে কটুক্তি শুনে অশ্রু ঝরল। সে অশ্রু এখনো ঝরছে। হয়তো এ অশ্রু ঝরতেই থাকবে। এভাবে আরও যে কতদিন অশ্রু ঝরেছে তা একমাত্র প্রতিপালক ছাড়া কেউ জানে না।

কমিটির সাথে আমার অমতের বিষয়গুলো :

নতুন কমিটি গঠন হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনদিন কমিটির কথা শুনি না মর্মে কোন অভিযোগ উঠেনি। নতুন কমিটি গঠন হওয়ার পরেও এ রকম নযীর নেই যে, কমিটির কথা মানা হয়নি। তবে কিছু বিষয়ে কমিটির সাথে অমিল হয়েছে, সেগুলো নিম্নে পেশ করা হল :

(১) পর্দাই আমাদের ভূষণ। জীবন দিয়ে হলেও যতদূর সম্ভব পর্দা রক্ষা করাকেই আমরা আমাদের প্রধান দায়িত্ব মনে করি। ২০১৩ সালের দিকে মাদরাসায় একটি চিঠি আসল। যাতে লেখা আছে প্রত্যেক মাসে কমিটির একটি দল মাদরাসায় আসবে শিক্ষিকাদের সাথে মত বিনিময় করবে। চিঠি খানা পেয়ে আমিও একখানা চিঠি লিখে অনুরোধ করলাম যে, পুরুষরা যেন না আসে বরং মহিলাদের একটা দল গঠন করলে ভাল হয়, তাহলে আমরা তাদের সাথে খোলামেলা সব কথাই বলতে পারব। পাশাপাশি বিষয়টি আমীরে জামা'আতের স্ত্রীর নিকটেও বললাম। তিনি আমাকে বললেন, ভাবী আপনি নিশ্চিন্তে থাকেন! পুরুষ কেন পুরুষের গন্ধও মহিলা মাদরাসায় যাবে না। আমি একটু আশ্বস্ত হলাম। হয়ত পুরুষ মানুষ আসবে না। হঠাৎ একদিন খবর আসলো আজ দশটার সময় কমিটির একটা দল মাদরাসায় আসবে। আমার মনের মাঝে কেন যেন অশান্তি বিরাজ করতে লাগল। এমনকি চোখের পানি ঝরতে লাগল। কারণ যে মানুষটি প্রতিষ্ঠানকে নিজের সন্তানের মত করে মানুষ করল, আজ সে মানুষটি সুস্থ-সবল বেঁচে আছেন। তার হায়াতে আমাকে অন্য পুরুষের সাথে মিটিংয়ে বসতে হবে এটা ভেবেই অঝোরে চোখের পানি ঝরতে লাগল। ইতিমধ্যে একটি দল এসে পড়ল। আমরা সব শিক্ষিকা সবাই অফিস রুমের ভিতরে থাকলাম আর তাদের বাহিরে বারান্দায় বসার ব্যবস্থা করলাম। এটাও

তাদের নিকট অপসন্দ হল, কেন আমরা তাদের বারান্দায় বসতে দিলাম? আসলে আমাদের কোন রুম ফাঁকা ছিল না। সব রুম চেয়ার-টেবিল বেঞ্চে ভর্তি। তাছাড়া আমাদের পর্দার আড়াল করার মত ব্যবস্থা ছিল না। তাই পর্দা রক্ষার্থেই আমরা তাদের বারান্দায় বসতে দেই। এইদিন বৈঠক হলেও তা ছিল নামে মাত্র। আমি কোন কথা বলিনি। এরপরে আর কোনদিন তাদের সাথে বৈঠকে বসিনি। একজন মুসলিমা নারী হিসাবে আমি যেমন এই কাজের জন্য গর্ব করি। তেমনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কমিটির লোকেরা এই ভাবে নারীদের সাথে বৈঠকে বসার জন্য চাপ দিবে সেটাও সমীচীন বলে মনে করি না।

(২) মাদরাসার কোন সমস্যার জন্য আমি নিজে থেকে সেক্রেটারীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করিনি। সব বিষয় পিয়ন মমতাজ কাকীর মাধ্যমে ফোনে সেক্রেটারীকে জানাই। আমার দোষ হচ্ছে, আমি নিজে কেন কখনো ফোন করিনি। এই কাজের জন্যও কমিটির ভেবে দেখা উচিৎ।

উপরের দু'টি কারণেই মূলত কমিটি আমার উপর নারাজ ছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময় যে বিষয়গুলো নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল এবং আমি কমিটির সিদ্ধান্ত মানিনি তা নিচে পেশ করা হল :

(ক) ২০১৪ সালে রুটিনের একটি বিষয় নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। ২০০৪ ইং হতে ২০১৪ ইং পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষিকাদের পরামর্শে আমি নিজে রুটিন করে আসি। কোন দিন কোন শিক্ষিকার এবং কোন ছাত্রীর কোনপ্রকারের অসুবিধা বা অভিযোগ সৃষ্টি হয়নি। ২০১৫ সালে এসে যখন সকল শিক্ষিকা নিয়ে রুটিন করলাম, তখন সেক্রেটারী ছাহেব রুটিন নিয়ে গিয়ে সমস্ত রুটিন পরিবর্তন করে পাঠালেন। তাতে কোন ক্লাসের ছাত্রীদের তেমন কোন অভিযোগ করেনি। কিন্তু ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীরা কঠিনভাবে অভিযোগ করল। তখন আমি সমস্ত শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে বললাম, রুটিন তো মূলত ছাত্রীদের সুবিধায় হওয়া উচিৎ। তখন শুধুমাত্র একজন শিক্ষিকা ছাড়া সব শিক্ষিকা একমত হলেন যে, ছাত্রীদের সুবিধা অনুপাতেই হওয়া ভাল। শিক্ষিকাদের অধিকাংশের মত ও ছাত্রীদের দাবীকে সামনে রেখে আমি শুধু ৮ম শ্রেণীর বিষয়টি ছাত্রীদের সুবিধা অনুপাতে রুটিনে পরিবর্তন করলাম। সেক্রেটারী ছাহেব আবারও রুটিন নিয়ে গেলেন এবং আবারও পরিবর্তন করে পাঠালেন। তখন সেক্রেটারী ছাহেবের সেই

রুটিন অনুপাতেই ক্লাস চলল। এখানেও তারা আমাকে অভিযুক্ত করল আমি কমিটি মানিনি।

স্মর্তব্য যে, রুটিনের বিষয়টি আমি যেহেতু দীর্ঘদিন হতে করে আসছি, সেই হিসাবে সেক্রেটারীর চেয়ে আমিই ভাল বুঝি রুটিন কেমন হবে। রুটিনের বিষয়টি যদি বিস্তারিত তুলে ধরি তাহলে অনেক বেশি হবে। তাই বিস্তারিত তুলে ধরলাম না।

(খ) ২০১৪ সালের ঘটনা। দু'টি গরিব বাচ্চা তিন মাস যাবৎ বোর্ডিং ফী দেয়নি। তাদের বোর্ডিং ফী কমানোর জন্য কমিটির নিকট বহু দরখাস্তের মাধ্যমে অনেক চেষ্টা করেছি মঞ্জুর হয়নি। একপর্যায়ে কমিটি বাচ্চা দু'টির আবাসিকের খাবার বন্ধ করে দেয়। তারা খুব কান্নাকাটি করছে এবং বাহিরের খাবার কোন হালাতে খাচ্ছে। সুফিয়া আপা আমাকে বললেন, আপা! বাচ্চা দু'টি খুব ভাল ছাত্রী। তাদের পড়াশুনার খুব ক্ষতি হচ্ছে। তাদের এই অবস্থায় আপনি কোন একটা ব্যবস্থা করেন। সুফিয়া আপাও কাঁদছেন। খাবার বন্ধ করার ৪র্থ দিন সকাল ৮টার একটু আগে আমি মাদরাসায় ঢুকছি, দেখি তারা দু'বোন গেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? তোমরা এখানে কাঁদছ কেন? অফিসে আস। তারা আমার সথে অফিসে আসল। কান্নার কারণে অসহায় মেয়ে দু'টি কোন কথায় বলতে পারছে না। শুধুই কাঁদছে। কান্নার মাঝেই বলল, আপা আমাদের খাবার বন্ধ করে দিয়েছে সেক্রেটারী ছাহেব। তাদের কথা ও কান্না দেখে আমিও চোখের পানি থামাতে পারলাম না। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রু। আহ! কুরআন-হাদীছ শিখতে আসা দু'জন ছাত্রী খাবারের অভাবে কাঁদছে। দ্বীনের দাওয়াতের দাবীদার এক শ্রেণীর ধ্বজাধরী কমিটি তাদের খাবার বন্ধ করে দিয়েছে। আমি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না। হায়! প্রতিদিন মাদরাসায় কত ভাত নষ্ট হচ্ছে। কত মানুষের নিকট থেকে গরীব-দুঃখী ও ইয়াতীমের নামে দেশ-বিদেশ থেকে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আর গরীব বাচ্চারা ভাতের অভাবে কাঁদছে। ক্বিয়ামতের মাঠে কমিটি ও কমিটির অভিভাবক আল্লাহ্‌র কাছে কি জবাব দিবেন? যে দ্বীনী ভাইয়েরা দেশ-বিদেশ থেকে সহযোগিতা করেন তাদেরকে কি জবাব দিবেন? যাদের পায়ের নীচে ফেরেশতা পর বিছিয়ে দেয় তাদের খাবার বন্ধ করে দিয়ে কোন্ জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন আপনারা দেখেন? গরীবের খাবার বন্ধ করে দেয়া কাদের স্বভাব? কোন্ রাসূলের আদর্শ?

জনগণকে আর কতদিন ধোঁকা দিবেন? কতদিন প্রতারণা করে নিজেদের অপকর্ম ঢেকে রাখবেন?

যাইহোক, সাথে সাথে আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের নিকট ফোন দিলাম এবং ঘটনা খুলে বললাম। তিনিও খুব কষ্ট পেলেন এবং সাথে সাথে ছাত্রী দু'টির জন্য টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সেই টাকা পিয়নকে দিয়ে বললাম, যাও! এই টাকা জমা দিয়ে বাচ্চাদের খাবার চালু করে দাও! তখন হতে তাদের খাবারের দায়িত্ব আমি নিয়ে আসছি। এখানে আমার অপরাধ হল, তারা খাবার বন্ধ করলেন। আর আমি তাদের খাবার চালু করলাম। বিবেচনা পাঠকের হাতে। আপনারা মাদরাসায় কি দান করেন এইভাবে গরীব-দুঃখীদের খাবার বন্ধ করে দেয়ার জন্য তাও আবার কুরআন-হাদীছের ছাত্রীর? আল্লাহুল মুসতা'আন।

(গ) একটি বাচ্চা সে দু'বছর যাবৎ ফ্রিতে লেখাপড়া করে আসছিল। ২০১৪ সালে এসে সেক্রেটারী তার নিকট হতে খাওয়া খরচ চান। তার মায়ের অনুরোধে তার পক্ষ হতে বিস্তারিত কারণ সহ দরখাস্ত লিখে পাঠাই। শরীফা ভাবীকে বলি, আপনি তো বাচ্চাটার খবর জানেন। তাহলে ভাইকে একটু বুঝান। তখন তিনি উত্তরে বলেন, আমি অনেক বলেছি আপনার ভাইকে। এসব তো সেক্রেটারীর হাতে। এভাবে কথা হতে হতে কুরবানীর ছুটি হয়ে গেল। এবার কুরবানীর ছুটির পর যখন মাদরাসা খুললো তখন উক্ত মেয়েকে গেট হতে মাদরাসায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। রাত্রি প্রায় ৯টার দিকে তার মা আমার নিকট ফোন করে বলছে, আপা! আমার বাচ্চাকে গেট হতে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমি ফোন দিয়ে বাচ্চাকে আবাসিকে নেওয়ার ব্যবস্থা করলাম এবং তখন হতে তার খাওয়া খরচও আমিই দিয়ে আসছি। (ছাত্রীদের নাম তাদের আত্মমর্যাদার কারণে উল্লেখ করা হল না।) তবে দু'জন ছাত্রী ছিল হাফেযীর ছাত্রী আর একজন ছিল ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী।

(ঘ) হিফয বিভাগের পরীক্ষা ফী নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০ টাকা। তখন আমি শরীফা ও খালেদা ভাবীকে বললাম, হিফযের ছাত্রীদের পরীক্ষা বাবদ আমাদের তো কোন টাকাই খরচ হয় না। ফী নেওয়ার তো কোন প্রয়োজন দেখি না। তাও যদি নিতেই হয়, তাহলে অল্প কিছু নেওয়া হোক। অভিভাবকদের কোন আপত্তি থাকবে না। তখন খালেদা ভাবী বলে উঠলেন, না! কমিটি যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই থাক। আমিও বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে তাই থাক এবং

কমিটির সিদ্ধান্তকে মেনে নিলাম। কিন্তু সেটাও আমার অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

এছাড়া কখনো কমিটির বিরুদ্ধে কিছু বলিনি বা করিনি। আর সংগঠনের বিরুদ্ধে কোন দিন কোন কথা মুখেও আনিনি। কারণ আন্তরিক ভাবে আমি একটু সংগঠনমুখী।

ছাত্রীদের সাথে আমার সম্পর্ক :

আমি ছাত্রীদের সবচেয়ে বেশি ভালবাসী, ছাত্রীরাও আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। সেজন্য শরীফা ভাবী আমাকে প্রায় বলতেন, ভাবী! ছাত্রীদেরকে আদব-শিষ্টাচারের ব্যাপারে আমাদেরকে আরও ভালভাবে উপদেশ দিতে হবে। কারণ ছাত্রীরা শুধু আপনার সামনে শিষ্টাচারের লেবাস পরে আসে আর আমাদের সাথে তেমন একটা শিষ্টাচারপূর্ণ আচারণ করে না। আর নাদিরা আপাতো এ ব্যপারে প্রায় বলেন যে, ছাত্রীরা শুধু বড় আপাকে বেশি সম্মান করে, ভালবাসে, ভয়করে আর আমাদেরকে তা করে না। আমি শুনতে শুনতে বললাম, সেটা আপনাদের ব্যর্থতা। কেননা শিক্ষিকাদের মাঝে আমি ছাত্রীদের বেশি মারধর করি, সেই হিসাবে তো আমাকেই বেশি খারাপ বাসার কথা ।

আমি জানি না যে ছাত্রীরা কেন আমাকে ভালবাসে? একমাত্র মহান আল্লাহই ভাল জানেন। তবে ছাত্রীদের একটু হলেও শিক্ষানোর জন্য যে আন্তরিকতা অপরিসীম চেষ্টা, সেটা ছাত্রীরা খুব ভালভাবে বুঝতে পারে। আমি জীবন বাজি রেখে ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি।

দায়িত্বের লোভী নই, পাঠদানের লোভী :

সম্মানিত পাঠক সমাজ! আমি দায়িত্বের লোভী নই, আমি পাঠদানের লোভী। কারণ দাখিল পাশের পর হতে শিক্ষকতার কাজ করে আসছি। কোন কারণবশত কোনদিন অসুস্থ হলে ক্লাসে না যাওয়া পর্যন্ত সুস্থ হতাম না। তাই আমি শত অসুস্থ হলেও যখন ছাত্রীদের সামনে গিয়ে হাজির হই, তখন সব অসুখ ভাল হয়ে যেত। ২০০৪ সাল ২২ শে ফেব্রুয়ারী প্রথমে 'মহিলা সালাফিয়াহ মাদরাসা' প্রতিষ্ঠা করে যখন হাজিরা খাতায় নাম স্বাক্ষর করা হবে, তখন শরীফা ভাবীকে বললাম, ভাবী আপনি দায়িত্বশীল হিসাবে স্বাক্ষর করেন। খালেদা ভাবীও উপস্থিত আছেন। শরীফা ভাবী বললেন, তা কি করে হয়। আপনি বড় আর আমি ছোট, আপনি কামিল পাশ আর আমি আলিম পাশ।

আর তাছাড়া আপনি একজন পুরাতন দায়িত্বশীল শিক্ষিকা আর আমি কিছুই না। তখন তারা দু'জনে বললেন এ কাজের হক্বদার আপনি।

আমি দায়িত্বের লোভী নই, পাঠদানের লোভী। কারণ হাযার অসুস্থ হলেও ক্লাসে গেলেই সব সেরে যায়। মাদরাসার যাবতীয় দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ৬/৭ ঘণ্টা পাঠদান করে আসছি। পাঠদানের ব্যাপারে যেমন আন্তরিকতা, ঠিক তেমনি পাঠদানে কোন ক্লান্তি নেই। তখন হতে এ পযন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছি। তারপর ২০০৯ সালে একবার বলেছিলাম, ভাবী আপনি দায়িত্ব পালন করেন। তখনও তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর ২০১৩ সালে একবার, ২০১৪ সালে একবার প্রস্তাব দিলাম। ভাবী, বিভিন্ন পরিবেশ আমাকে খুব একটা ভাল লাগে না, আমি খুশি মনে আপনাকে দায়িত্ব দিচ্ছি আপনিও খুশি মনে মেনে নেন। আপনাকেও ভাল লাগবে আমাকেও ভাল লাগবে। কিন্তু তিনি কোন দিনই রাযী হননি। বরং বলেছিলেন, আপনার উপস্থিতিতে আমি (শরীফা) দায়িত্ব পালন করবো সেটা কি শোভা পায়?। ২০১৪ সালের সেই বৈঠকে বলেছিলাম, ভাবী দায়িত্ব আপনাকে দেওয়ার জন্য আমীরে জামা'আতের নিকট একটা পত্র লিখেছি, কিন্তু পত্রটি এখনো দেইনি। আপনার সাথে পরামর্শ করে দিব। তখন তিনি বলেছিলেন দিতে হবে না। শরীফা ভাবীর কথামত পত্রটি আর দেওয়া হয়নি। তিনি বলেছিলেন, আপনি দায়িত্ব পালন করেন আর আমকে কিছু কাজ দেন। তাই সকল শিক্ষিকার উপস্থিতে ১৫ সালে বলেছি ভাবী আপনার কমিটির সাথে যোগাযোগ আছে আর আমার নেই, তাহলে আপনি আমাকে সহযোগিতা করবেন এবং আপনি সব কিছুই করেন। আর আমি যেভাবে আছি সেভাবে থাকি। তখন তিনিও বলেছিলেন ঠিক আছে। আর ২০১৩ সালে আমীরে জামা'আতের বাসায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীকেও বলেছিলাম, আমাকে দায়িত্ব পালন করতে ভাল লাগছে না, দায়িত্বটা শরীফা ভাবীকে দিয়ে দিব। তখন তিনি বলেছিলেন, ভাবী আপনি এই প্রতিষ্ঠানের মা, আপনি যতদিন আছেন ততদিন থাকবেন। আপনার ভাই আপনার পর আর অন্য কাউকে ভাবতেই পারেন না। এতবার প্রস্তাব দেওয়ার কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন সময় দায়িত্ব নিয়ে ক্লাসের বিঘ্নতা ঘটে, যা আমাকে পিড়া দেয়। আর তাছাড়া পরিবেশ আঁচ করে সম্মান বজায় রাখতে চাচ্ছিলাম। অব্যহতি পত্র আসার পরও কোন মনকষ্ট নেই। মানুষ হিসাবে হয়তোবা এক রকম লাগতেই পারে। তাহলে মর্মাহত হলাম কেন? অব্যহতি পত্রের সাথে সাথে উচ্চপদস্থ কমিটির নিকট হতে কিছু উপঢৌকন পেয়েছি, যা আমাকে মর্মাহত করেছে। খালেদা ভাবীকেও কয়েকবার

বলেছি, শরীফা ভাবীকে দায়িত্ব দিয়ে আমি ফ্রি ভাবে মাদরসায় যাব, আসবো। আমার পয়সা-পাতিরও তেমন কোন প্রয়োজন নেই। আমার একটাই অসুবিধা যে, ছোট বেলা হতে অর্থাৎ দাখিল পাশের পর হতে এই শিক্ষকতার কাজ করে আসছি, তাই মাদরাসায় না আসলে থাকতে পারি না। প্রতিষ্ঠান গড়েছি এখন কে চালাবে চালাক। আর আমার মনে বড় স্বাদ মরা পর্যন্ত শুধু একটু দরস দিব। তাই আমি দায়িত্বের লোভী নয়, পাঠদানের লোভী ।

বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠার সূচনা :

যখন ২০১০ সালে পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটির হাতে মাদরাসা তুলে দেওয়া হল। তখন যিনি পুরাতন কমিটিতে ছিলেন সভাপতি তিনি নতুন কমিটিতে কেউ নন। এর নযীর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। আসলে আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব মানুষটাই যে যারপরনাই সহজ-সরল। এটা তার বাস্তব প্রমাণ। সেই মানুষটা এগুলো নিয়ে একটু ভেবেও দেখেনি। অথচ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন তিনি পুরাতন কমিটির সাধারণ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও নতুন কমিটিতে তিনিই জায়গা পেলেন। অন্য কেউ হলে এটাকে ইনসাল্ট মনে করে অনেক কিছু করত। কিন্তু এ সরলমনা মানুষটি কিছুই মনে না করে মাদরাসার যাবতীয় দেখভাল করতে থাকলেন আগের মতই। এভাবে চলতে থাকল ২০১৩ সাল পর্যন্ত। ২০১৩ সালে তিনি একদিন আমীরে জামা'আতের সামনে বলছেন, মহিলা মাদরাসার জন্য একটা জেনারেটর কিনতে চাচ্ছি। উত্তরে আমীর ছাহেব বললেন, 'আপনি মহিলা মাদরাসার কে? ভাবখানা মনে হচ্ছে আপনি মহিলা মাদরাসার পিন্সিপ্যাল'? আমীরে জামা'আতের এই জবাব শুনে এই সহজ-সরল মানুষটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। এতদিন পর তার হুঁশ ফিরল। তার হাতে গড়া মাদরাসার তিনি আর কেউ নন। এই ঘটনার পর থেকেই আমি প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব শরীফা ভাবীর হাতে দেওয়ার জন্য কয়েকবার প্রস্তাব দিয়েছি। তাছাড়া ছাত্রীদের কেউ চলে গেলে 'টিসি' আমিই দিতাম। সেটার ব্যাপারেও হঠাৎ একদিন সেক্রেটারীর পক্ষ হতে নিষেধ আসল, আমি না-কি 'টিসি' দিতে পারব না।

২০১৪ সালে এসে যখন তখন সেক্রেটারী শিক্ষিকাদের হাযিরা খাতায় এসে লালকালি দিয়ে যায়। এমনকি ছাত্রীদের দৈনন্দিন ছুটিও সেক্রেটারী ছাহেব দিতে লাগলেন। তবে মাদরাসার বিশৃংখলা বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি

সেটা পরিবর্তন করেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন পরিবেশ বলে দিচ্ছে যে, অতিসত্ত্বর আমাকে এই প্রাণপ্রিয় মাদরাসা ছেড়ে দিতে হবে।

বিদায়ী ঘণ্টা যখন বাজলোই :

২০০৯ সালে একবার শরীফা ভাবীকে বলেছিলাম, ভাবী! আপনি দায়িত্ব পালন করেন। ভাবী তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর ২০১৩ সালে আবার তাকে অনুরোধ করলাম, দাযিত্ব পালন করতে। ২০১৪ সালে জোরদারভাবে প্রস্তাব দিলাম, ভাবী! বিভিন্ন পরিবেশে আমাকে খুব একটা ভাল লাগছে না দায়িত্ব পালন করতে। আমি খুশি মনে আপনাকে দায়িত্ব দিচ্ছি। আপনিও খুশি মনে মেনে নেন। আপনাকেও ভাল লাগবে আমাকেও ভাল লাগবে। কিন্তু তিনি কোন দিনই কোনমতে রাযী হননি। বরং তিনি বলেছিলেন, আপনার উপস্থিতিতে আমি (শরীফা) দায়িত্ব পালন করবো, সেটা কী শোভা পায়। ২০১৪ সালের এক বৈঠকে বলেছিলাম, ভাবী! দায়িত্ব আপনাকে দেওয়ার জন্য আমীরে জামা'আতের নিকট একটা পত্র লিখছি। পত্রটি এখনো দেইনি। আপনার সাথে পরামর্শ করে দিব। তখন তিনি পত্র দিতে জোরদারভাবে নিষেধ করেছিলেন। শরীফা ভাবীর কথামত পত্রটি আর দেওয়া হয়নি। ২০১৫ সালে সকল শিক্ষিকার উপস্থিতিতে বলেছি, ভাবী! আপনার কমিটির সাথে যোগাযোগ আছে আর আমার নেই। আপনি সব কিছুই করেন। আর আমি যেভাবে আছি সেভাবেই থাকি। তখন তিনিও বলেছিলেন ঠিক আছে। ২০১৩ সালে আমীরে জামা'আতের বাসায় গিয়ে আমীরে জামা'আতের স্ত্রীকেও বলেছিলাম, আমাকে দায়িত্ব পালন করতে ভাল লাগছে না। আমি দায়িত্ব শরীফা ভাবীকে দিয়ে দিব। তখন তিনি বলেছিলেন, ভাবী! আপনি এই প্রতিষ্ঠানের মা। আপনি যতদিন আছেন ততদিন আপনিই থাকবেন। আপনার ভাই আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতেই পারে না।

২০১৫ সালের ২২ ডিসেম্বরে জানতে পারলাম যে, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফকে মাদরাসা হতে অব্যহতি দিয়েছে। তখন থেকে আমীরে জামা'আতের মেয়ে তামান্না ও তার স্ত্রীর সাথে একটু কথা বলার জন্য মায়ের বাড়ি গাইবান্ধা হতে ফোনের মাধ্যমে বহু চেষ্টা করছি। ফোন রিসিভ হয় না কোন ভাবেই। তারপর ঢাকা সফর সেরে বাসায় আসলাম। আমার ছোট ছেলে ও তার ছোট ছেলের মাধ্যমে আমীরে জামা'আতের স্ত্রীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম

অনেক। যখনই যোগাযোগ করি তখনই বলে এখন বাহিরে আছি। আবার কখনো বলে এখন আম্মু ব্যস্ত। আবার কখনো বলে এখন আম্মু রান্না করছে। শেষ পর্যন্ত বলেছিলাম, বেশি কথা বলব না সামান্য দু'মিনিট দু'টা কথা বলব। কিন্তু জানি না কেন কথা বলা হয়নি।

এবার ২০১৬ সাল শুরু হল। আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেব মালয়েশিয়া প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন। সেখান হতে এসে তিনি আমীরে জামা'আতের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য গেছেন। তিনি যখনই বহির্বিশ্বে যান, তখনি সাক্ষাৎ করে যান এবং ফিরে এসেও দেখা করেন। তাই সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আপনার জীবদ্দশায় এই রকম সিদ্ধান্ত আমি কল্পনা করিনি। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে ভাল হত'। তখন আমীরে জামা'আত রাগান্বিত ভাবে বলেন, 'না! সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যাবে না। আপনার স্ত্রীকেও প্রধান শিক্ষিকা থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে সেটা আপনাকে শুনানো হয়নি'?। তখন আব্দুর রাযযাক ছাহেব বাসায় এসে আমাকে ফোনে জানালেন এই এই ঘটনা। তখন আমি সংবাদটি শুনে মন একটু খারাপ হলেও কাউকেই বুঝতে দেইনি। পরীক্ষার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সারলাম। তারপর ৩রা জানুয়ারী ৯/১০টার দিকে দু'টি চিঠি আসল অফিসে, একটি শরীফা ভাবীর নামে আর অপরটি আমার নামে। চিঠি খুললাম, দেখি দায়িত্ব অপসারণের চিঠি। আগামীকাল ৪ তারিখে শরীফা ভাবীর নিকট দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। বাড়ির কাজের মেয়ে যদি মালিকের কোন জিনিস চুরি করে, তাহলে তাকে ধমক দিয়ে বলা হয়, এরপর আবার যদি এমন করিস তাহলে তোকে বের করে দিব। কিন্তু আমাকে সর্তকতা মূলক কোন নোটিশ না দিয়ে কাজের মেয়ে সুলভ আচারণও করা হয়নি ।

তারপর পিয়নকে বললাম, 'কাকি! সেক্রেটারীর নিকট চিঠি ফিরিয়ে দাও। আর বল! বড় আপা আপনাদের এই সিদ্ধান্তে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন না। তিনি কাল বা পরশু নিজে থেকেই দায়িত্ব শরীফা আপাকেই দিবেন'। কেননা আমাকে কোন কমিটি নিয়োগ দেয়নি যে, সে অব্যাহতি দিবে। যেহেতু আমি কারো নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল নই। সেহেতু কারো আমাকে অব্যহতি দেয়ার সিদ্ধান্তও অযৌক্তিক।

৫/৬ তারিখে সমস্ত শিক্ষিকার উপস্থিতিতে রুটিনের কাজ করলাম। কমিটির লোকজন মাদরাসায় আসল। তারা সকল শিক্ষিকার উপস্থিতিতে শরীফা ভাবীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। সেই সময় শিক্ষিকাদের পক্ষ হতে কোন

একজন শিক্ষিকাও কথা বলেন নি যে, আমরা তাকে দায়িত্বশীল হিসাবে গ্রহণ করলাম। তারপর ৬ তারিখে মাদরাসায় গিয়ে দেখছি, অফিসে হাজিরা খাতা নেই। কি হয়েছে? পিয়ন বলল, প্রধান শিক্ষিকার ঘর আলাদা করা হয়েছে। সেখানে প্রধান শিক্ষিকার ঘরে আছে। ঠিকই দেখি সেই ঘরের দরজায় মোটা অক্ষরে লেখা আছে 'প্রধান শিক্ষির কার্যলায়'। ভিতরে ঢুকে দেখি আলাদা চেয়ার-টেবিল। সুন্দর করে পরিপাটি করে সাজানো আছে। এতদিন সব শিক্ষিকা এক রুমে এক টেবিলে থাকলাম আর ৪ তারিখে দায়িত্ব হস্তান্তর করে ৫ তারিখে সব কিছু আলাদা। আমি ৬ তারিখে খাতায় স্বাক্ষর করতে গিয়ে দেখি পৃষ্ঠা পরিবতর্ন করে নাম কাটাকাটি করে রেখেছে। আমার নাম সহকারীতে রেখেছে। আমি যেহেতু বলেছিলাম, আমাকে কোন কমিটি নিয়োগ দেয়নি সেহেতু কারো আমাকে অব্যহতির সিদ্ধান্ত দেয়া অযৌক্তিক। আমি নিজে থেকেই দায়িত্ব ছেড়ে দিব। সেই হিসাবে তখন আমি লালকালি দিয়ে পরিবর্তিত হাযিরা খাতাকে কেটে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম এবং প্রতিদিন যেভাবে স্বাক্ষর করতাম সেভাবেই স্বাক্ষর করলাম। ৭ তারিখে গিয়ে দেখি হাযিরা খাতা নেই। সব শিক্ষিকার নিকট সাদা পাতায় স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছে। আমিও তাই করলাম। আমি আগে হতে অসুস্থ ছিলাম, সে জন্য ডাক্তার আমাকে বেড রেষ্ট দিয়েছেন। তখন হতে আর মাদরাসা যাইনি। শুধু বলে দিয়েছি রুটিনে আমার বিষয়গুলো অন্য শিক্ষিকাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে। ১৭ জানুয়ারী ফোন করে পিয়নকে ও শরীফা ভাবীকে বলে দিলাম, 'সকল ছাত্রী-শিক্ষিকাদেরকে আমার সালাম দিবেন এবং দু'আ করতে বলবেন, আমি আর মাদরাসায় যাচ্ছি না'।

সম্মানিত কমিটি! আমার ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত নিতে আপনাদের অন্তর একটুও কাপলো না। যে প্রতিষ্ঠান জিরো হতে আজ হিরো রূপ নিয়েছে কার অবদানে, কে সে অধম? কুচক্রিদের মিথ্যা অপবাদে এই লোমহর্ষক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রীদের উত্তম শিক্ষা দেওয়া হতে বঞ্চিত করলেন? একদিনও একটুও যাচাই-বাচাই করলেন না যে, এত কথার কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা। কিন্তু আজ আপনারা তদন্ত না করলেও কাল ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই দেখতে পাবেন, কে কত মিথ্যারোপকারী, কুচক্রি আর কত অমান্যকারী। আমার ইচ্ছা ছিল সুন্দর পরিবেশে নিজ থেকে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে

কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই মরা পর্যন্ত ছাত্রীদের দারস দিব। কিন্তু সেটুকু আর পূর্ণ হল না।

সম্মানিত কমিটি! জেনে রাখা ভাল হবে যে, আপনারা হয়তবা আমার পার্থিব জীবনের সামান্য হতে সামান্য কিছু ক্ষতি করলেন, যা আল্লাহ্‌র নিকট একটা মশার পাখার সমতুল্যও নয়। আর আমার দ্বারা আপনাদের পরকালীন যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, সে ক্ষতিপূরণ করার কোন পথ থাকবে না কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে। প্রতিপালক! তুমি সবাইকে হেদায়াতের উপর রাখ। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হতে রক্ষা কর। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাওফীক্ব দান কর- আমীন! আল্লাহুম্মা আমীন!!

(রাযিয়া)
প্রধান শিক্ষিকা
মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা

সমাপ্ত